৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার-০১

টপিক: বাংলাদেশের ভূগোল, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও সুবিধা, সমুদ্র বিজয়, জনসংখ্যাতত্ত্ব, উপজাতিদের অবস্থান। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্লু-ইকোনমি।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

➲ বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে আমরা যা যা জানতে পারি-

➢ অবস্থান

➢ সীমানা

➢ অর্জন

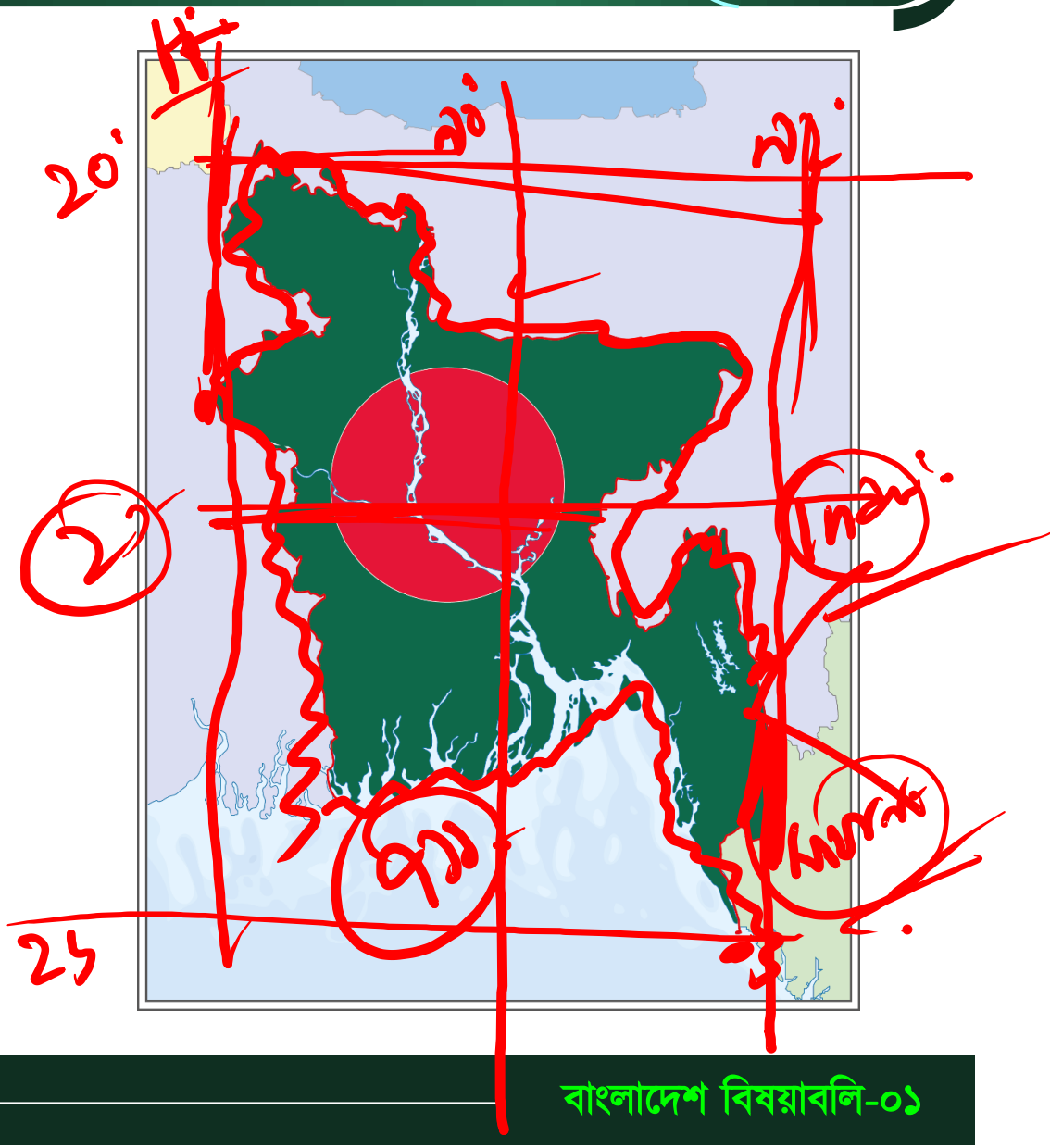

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

- এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান।
- ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে।
- বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।
- কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। যথা- চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি।
- বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকি.মি বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
- আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৪তম।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

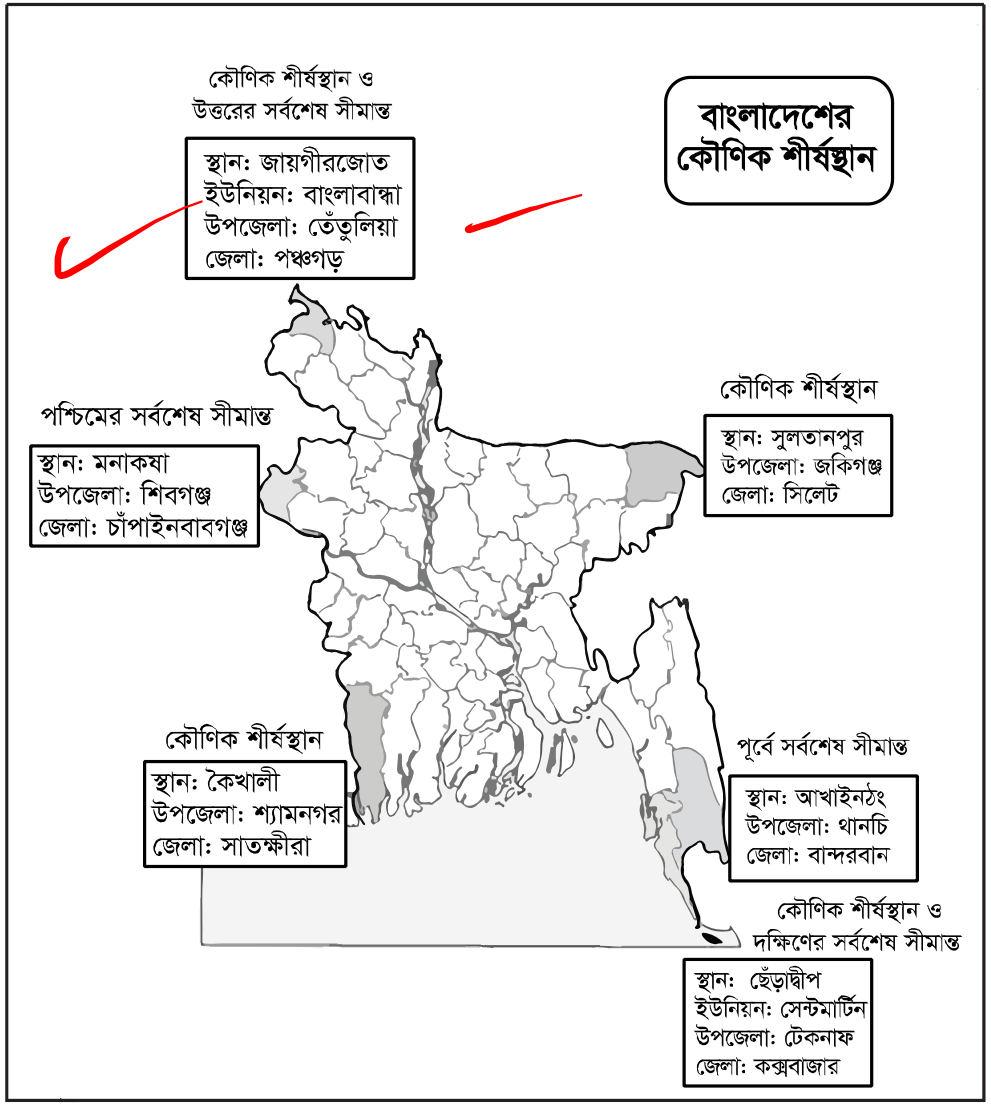

বাংলাদেশের সীমানা

❑ বাংলাদেশের সীমানার দৈর্ঘ্য

সীমানা দৈর্ঘ্য	উৎস	সীমারেখা
মোট সীমানা	মাধ্যমিক ভূগোল	৪,৭১১ কি.মি.
	বিজিবি	৫,১৩৮ কি.মি.
স্থল সীমানা	জাতীয় তথ্য বাতায়ন	৪,২৪৬ কি.মি.
	বিজিবি	৪,৪২৭ কি.মি.
বঙ্গোপসাগরের তটরেখা	মাধ্যমিক ভূগোল	৭১৬ কি.মি.
	বিজিবি	৭১১ কি.মি.

সীমানা দৈর্ঘ্য	উৎস	সীমারেখা
বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমা	জাতীয় তথ্য বাতায়ন	৪,০৫৩ কি.মি.
	মাধ্যমিক ভূগোল	৩,৭১৫ কি.মি.
	বিজিবি	৪,১৫৬ কি.মি.
	ভারতের হাই কমিশন	৪,০৯৬ কি.মি.
বাংলাদেশ-মিয়ানমার স্থল সীমা	জাতীয় তথ্য বাতায়ন	১৯৩ কি.মি.
	মাধ্যমিক ভূগোল	২৮০ কি.মি.
	বিজিবি	২৭১ কি.মি.

বাংলাদেশের সীমানা

❑ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলার সংখ্যা

মোট জেলা	৬৪টি
ভারতের সাথে সীমান্ত জেলা	৩০টি
মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত জেলা	৩টি (রাঙামাটি উভয় দেশের সাথে সংযুক্ত)

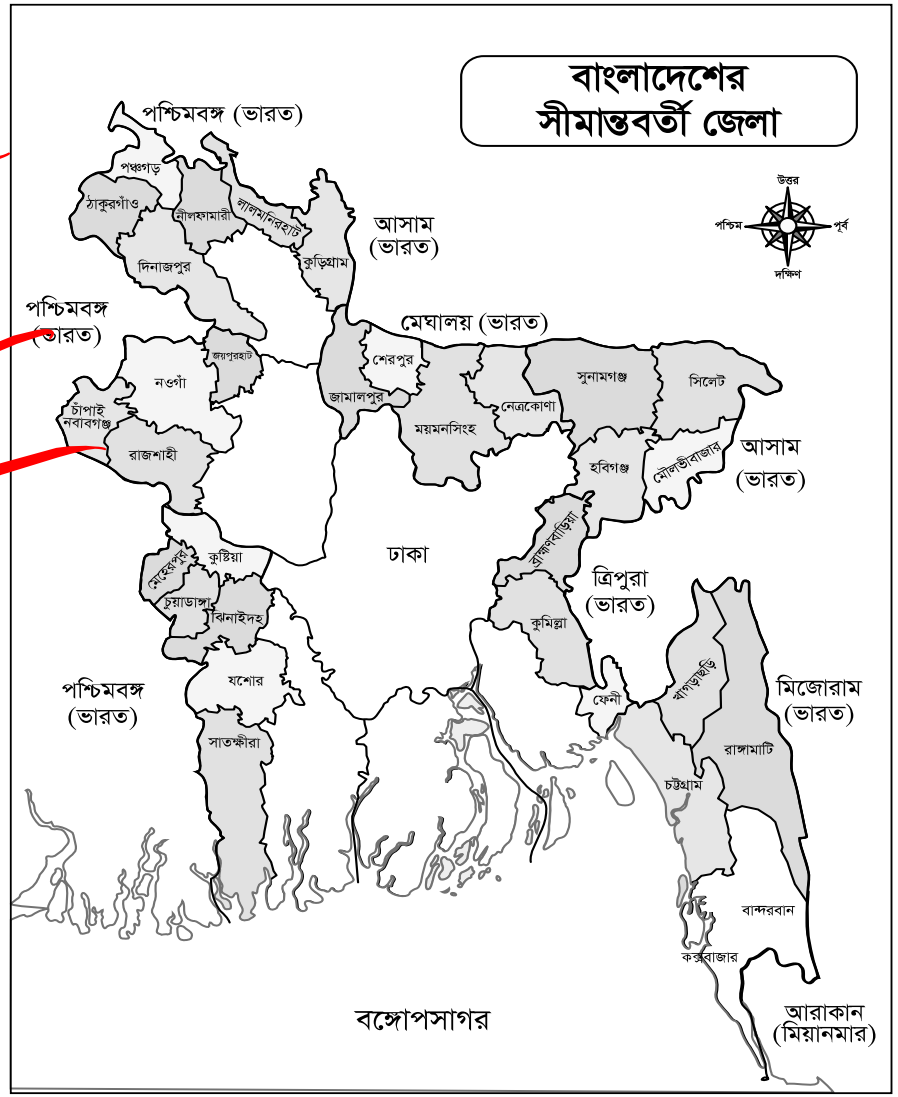

বাংলাদেশের সমুদ্রবিজয়

বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সমুদ্রসীমা আছে- **ভারত ও মিয়ানমার।**

- **বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমারঃ**
  - এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় **২০১২ সালের ১৪ মার্চ**।
  - জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) এ সমুদ্র বিষয়ক এ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়।
  - মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় **১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি**।
- **বাংলাদেশ বনাম ভারতঃ**
  - এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা হয় নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত- Parmanent Court of Atribution (PCA) –এ।
  - এই সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় হয় **২০১৪ সালের ৭ জুলাই**।
  - বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ ছিল ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.। মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় **১৯,৪৬৭ কি.মি.**।

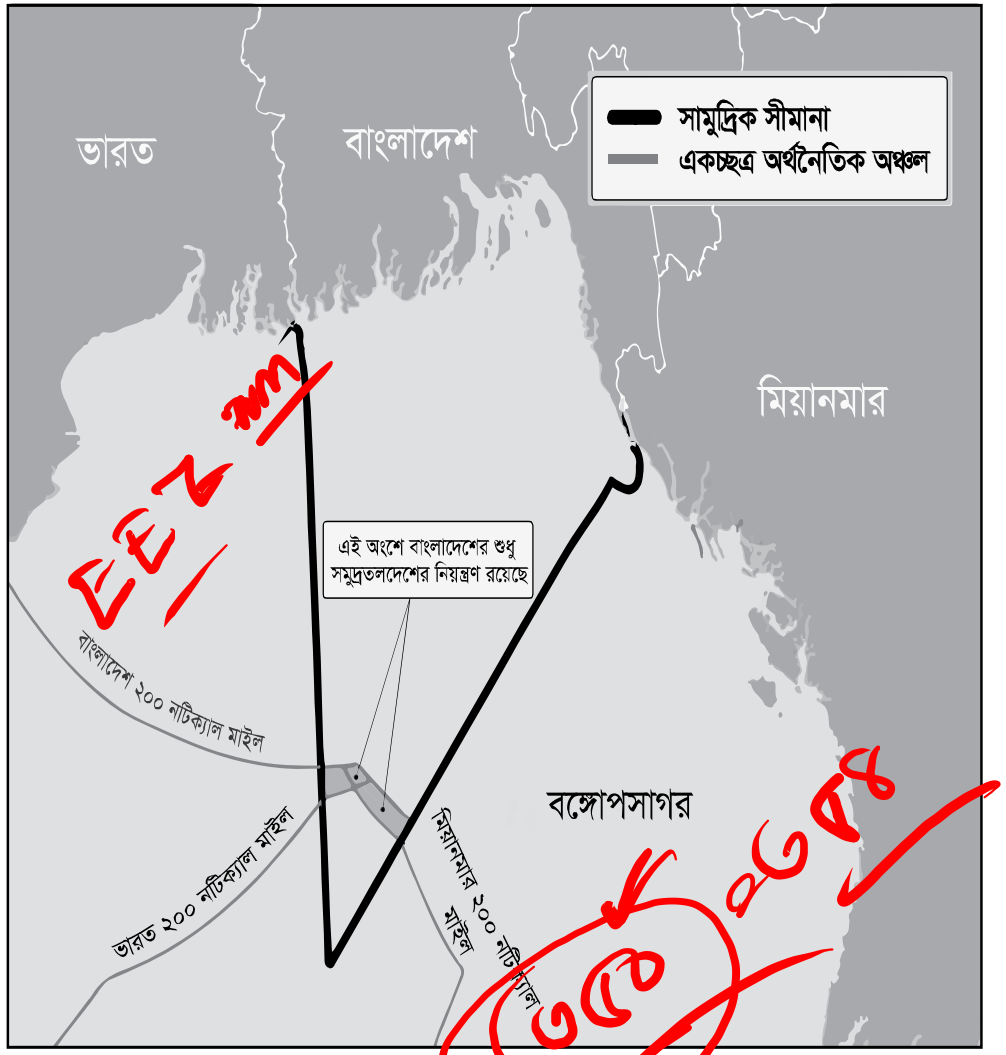

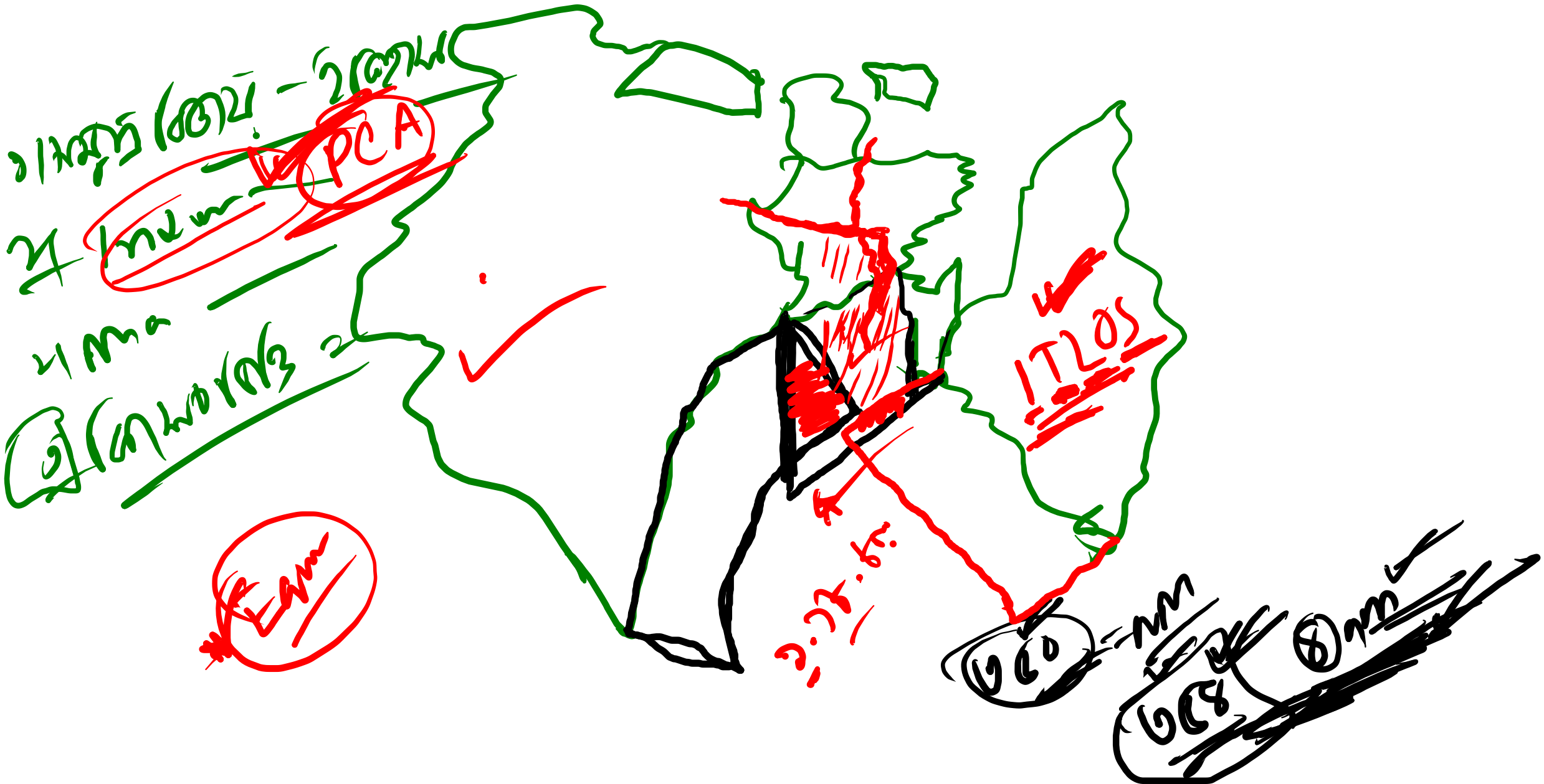
PCA
ITLOS

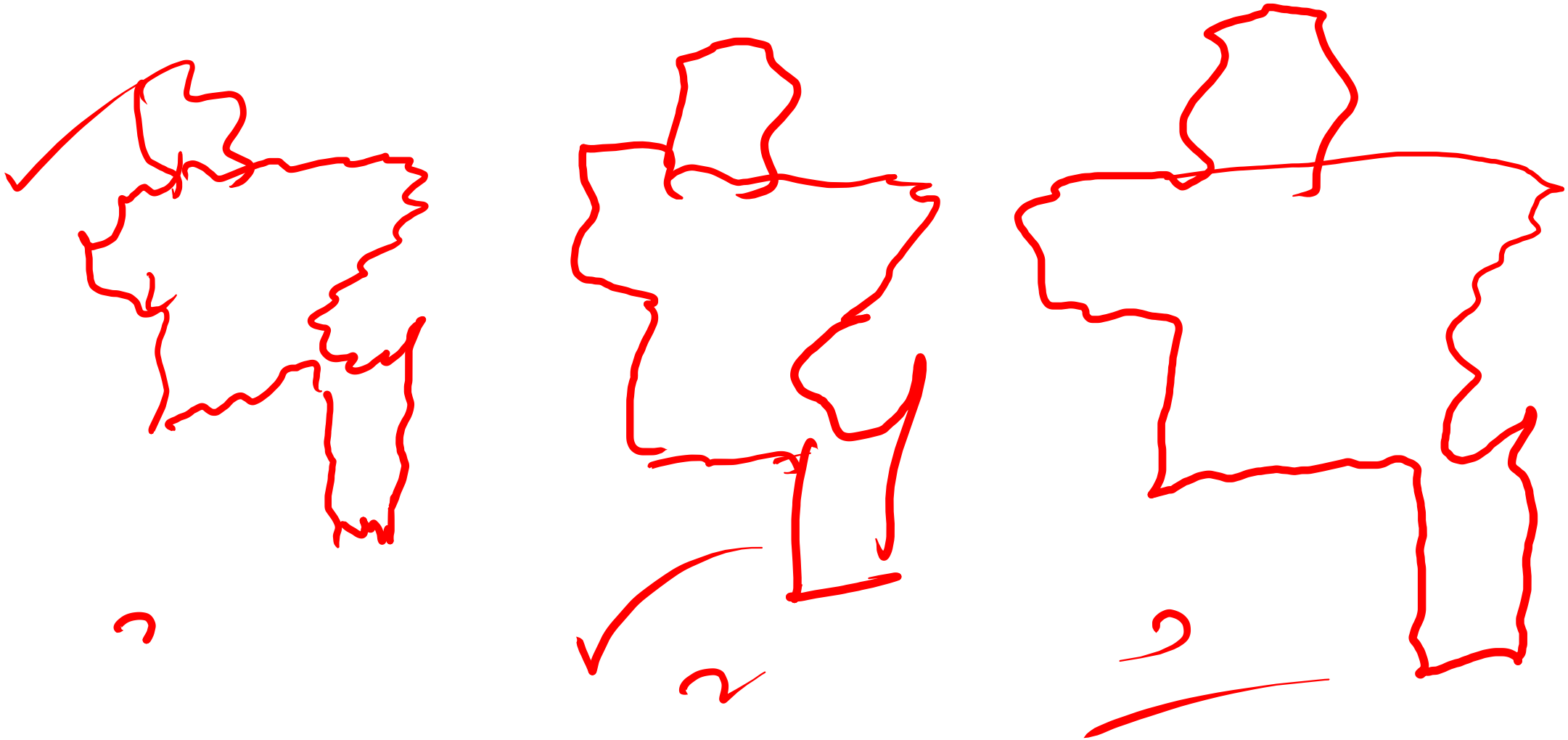

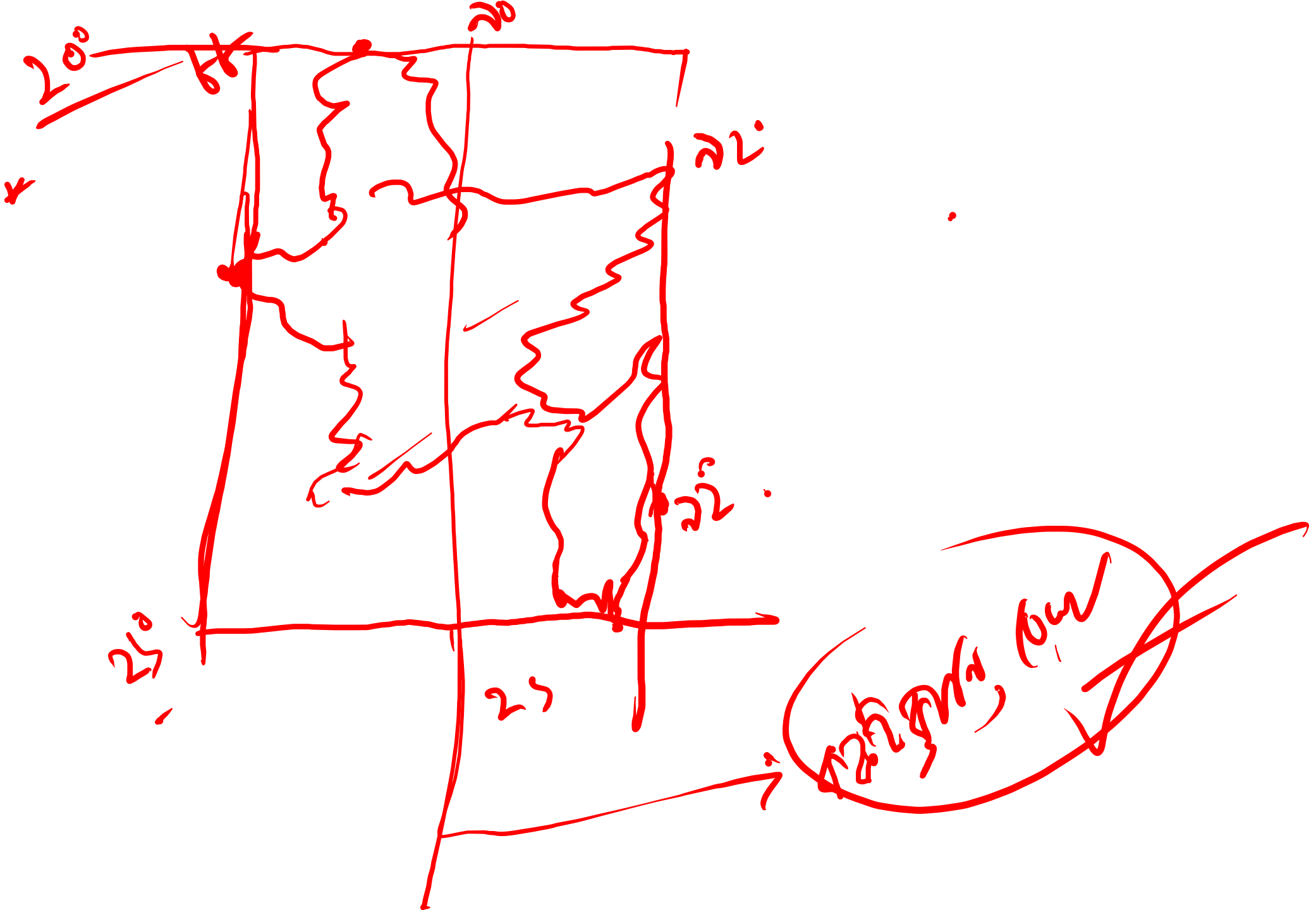

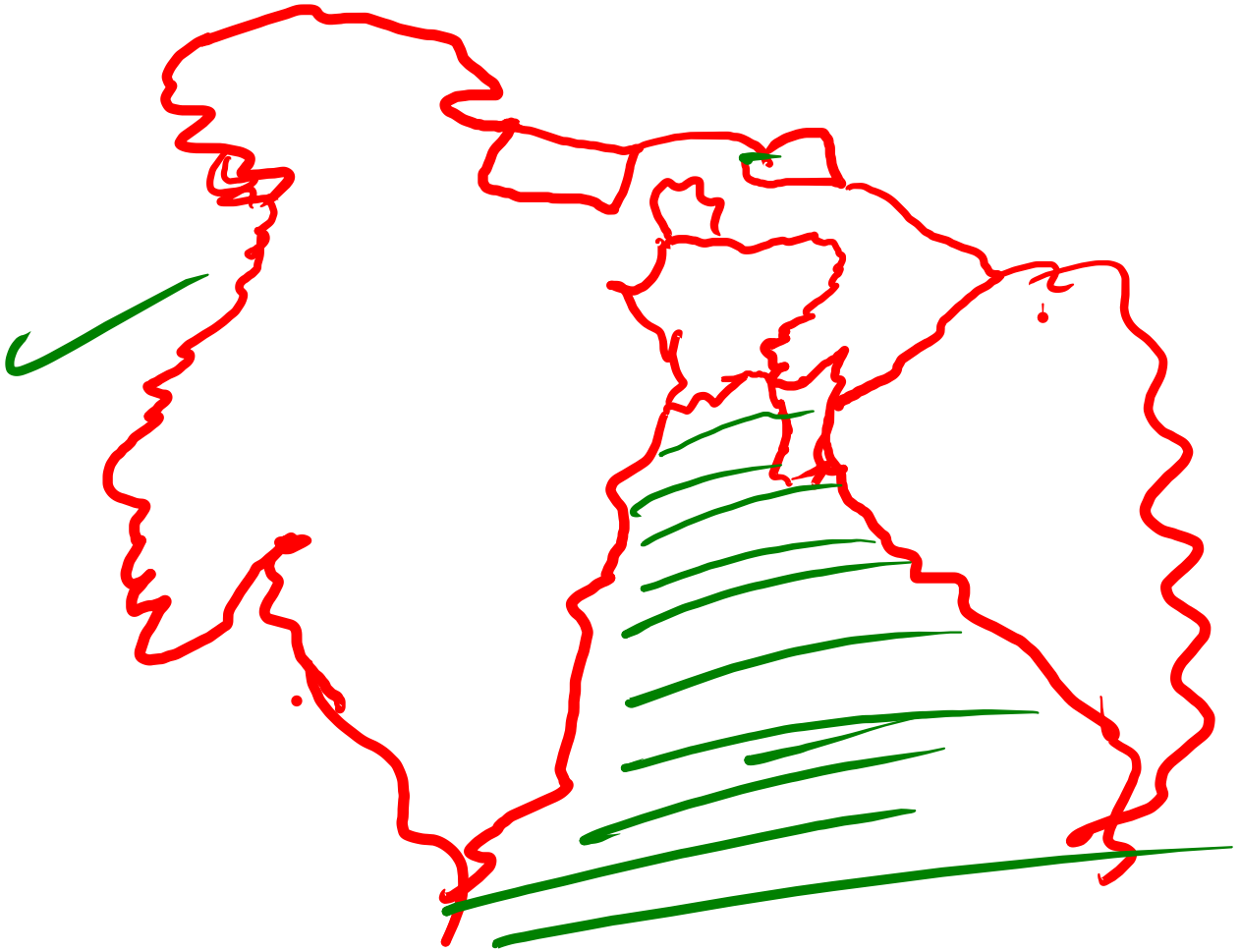

বাংলাদেশের সমুদ্রবিজয়

- প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারনের বিষয়টি সুরাহা হওয়ায় বাংলাদেশ যা যা লাভ করেছে-
  - ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. টেরিটোরিয়াল সমুদ্র।
  - ১২ নটিক্যাল মাইল রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা।
  - ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল(Exclusive Economic Zone-EEZ)।
  - চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার।

- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্যঃ
  - সন্নিহিত সমুদ্রসীমার পর থেকে অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ১৭৬ নটিক্যাল মাইল।
  - অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার পর থেকে মহীসোপান ১৫০ নটিক্যাল মাইল।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

শ্রেণি যুগবিভাজন	সময়কাল	ভূ-প্রকৃতি	বৈশিষ্ট্য
টারশিয়ারি	২ মিলিয়ন বছর পূর্বে	টারশিয়ারি যুগের পার্বত্য ভূমি বা পাহাড়সমূহ	উচ্চভূমি ও নিবিড় বনভূমি
প্লাইস্টোসিন	২৫০০০ বছর পূর্বে	প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর বা সোপানসমূহ	সমভূমি থেকে সামান্য উচ্চভূমি ও অনিবিড় বনভূমি
হলোসিন বা সাম্প্রতিক সময়	এখনো বর্তমান	সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল বা পলল সমভূমি	নদীবিধৌত বিস্তৃত পলি মৃত্তিকার সমভূমি

ভূপ্রকৃতি

৩ প্রকার

ক) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

খ) সোপানসমূহ

গ) সমতল ভূমি

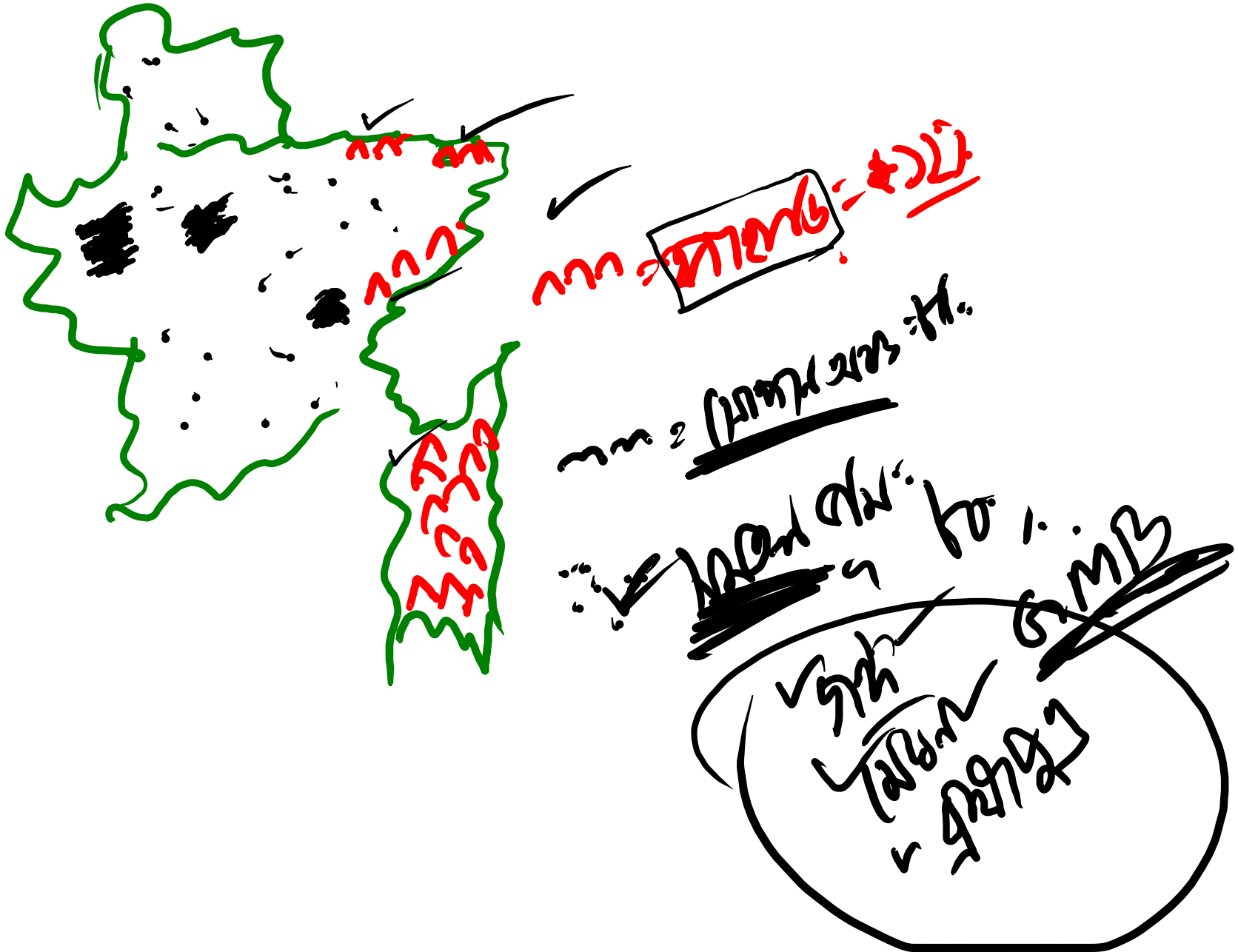

❑ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ গঠিত। আজ থেকে প্রায় দুই মিলিয়ন বছরেরও আগে টারশিয়ারি যুগে হিমালয়ের উত্থানকালে এই পাহাড়গুলোর সৃষ্টি হয়। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এই এলাকায় ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বা পাহাড়ি বনভূমি অবস্থিত। অবস্থান অনুসারে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:
(১) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ; (২) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

পাহাড়	অবস্থান	তথ্য
দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ।	• দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে এ পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। • এ অঞ্চলের দক্ষিণ–পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কেওক্রাডং যার উচ্চতা ১২৩০ মিটার। • বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং (বিজয়) এর উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। তবে সরকারি হিসাব মতে, তাজিংডং এর উচ্চতা ১২৮০ মিটার।
উত্তর ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর–পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ।	• গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। • উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় পাহাড়ের ঢালে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

❑ প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে প্লাইস্টোসিনকালের সোপান অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। এই অঞ্চলে শালবন বা পত্রঝরা বৃক্ষের বন রয়েছে। অবস্থান অনুসারে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

- বরেন্দ্রভূমি;
- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়;
- লালমাই পাহাড়;

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

পাহাড়	অবস্থান	তথ্য
বরেন্দ্রভূমি	দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ।	৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিনকালের সর্ববৃহৎ উঁচুভূমি।
মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়	টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং ময়মনসিংহ জেলা ও গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড়।	গজারি বৃক্ষের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গ কিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।
লালমাই পাহাড়	কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত।	আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার। গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ পাহাড়ের মাটি লাল। পাহাড়টি নুড়ি, বালি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

❑ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই বিস্তৃর্ণ সমভূমিই সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে এখানে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার পানির সঙ্গে প্রবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর। এ অঞ্চলগুলো কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এ অঞ্চলটি সর্বত্র একইরূপ নয় বলে একে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- **পাদদেশীয় সমভূমি:** রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে পাদদেশীয় সমভূমি গঠিত। হিমালয় পর্বত পতিত পলল দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার।

- **বন্যা প্লাবন সমভূমি:** ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট বন্যা প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।

ব-দ্বীপ সমভূমি: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমভূমিকে সাধারণত ব-দ্বীপ বলা হয়। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

সক্রিয় ব-দ্বীপ: পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে গড়াই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ব-দ্বীপ সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ বলে। এর পূর্বাংশীয় অঞ্চল প্রতি বছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরের বিল বা হাওড়গুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এবং শীতকালে বোরো ও ইরি ধানের চাষ হয়।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ: বাংলাদেশের ব-দ্বীপ সমভূমির মধ্যে গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়। এটা বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানব্যাপী বিস্তৃত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ভরাট হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলো প্রায় শুকিয়ে যায়। বর্ষাকালেও এসব নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না।

৫. চাঁদ

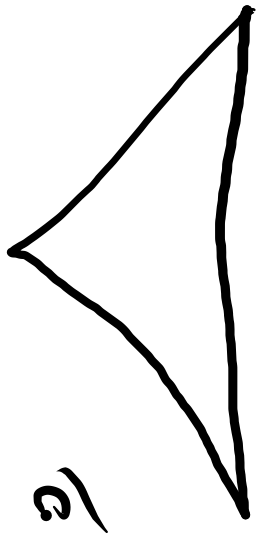

ক

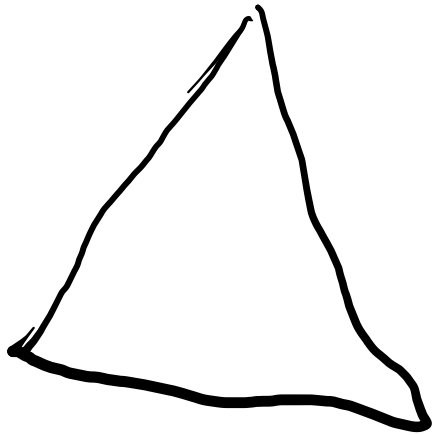

খ

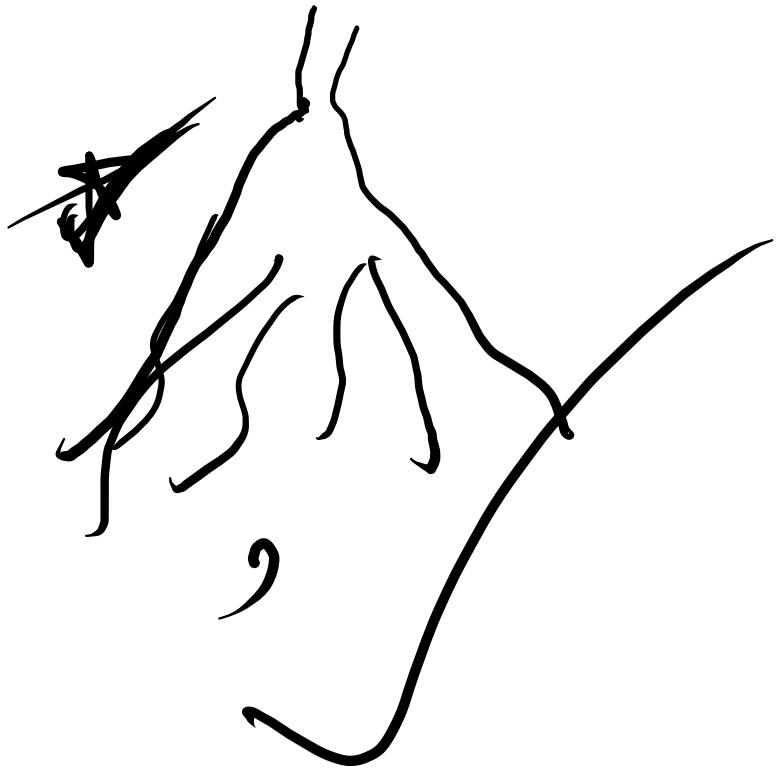

গ

স্রোতজ সমভূমি: বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমির দক্ষিণ ভাগের যে অংশে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সে অংশকে স্রোতজ সমভূমি বলে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট বহু নদীনালা আছে। এগুলো অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও খাঁড়িতে বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বা গড়ান বৃক্ষের বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমি সুন্দরবন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের নদীতে প্লাবন খুব কম হয় কিন্তু নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়।

উপকূলীয় সমভূমি: এ সমভূমি ফেনী নদী হতে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি গড়ে প্রায় ৯.৬ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু কর্ণফুলী নদীর মোহনায় এর দৈর্ঘ্য ২৫.৬ কিলোমিটার। এ সমভূমি কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত।

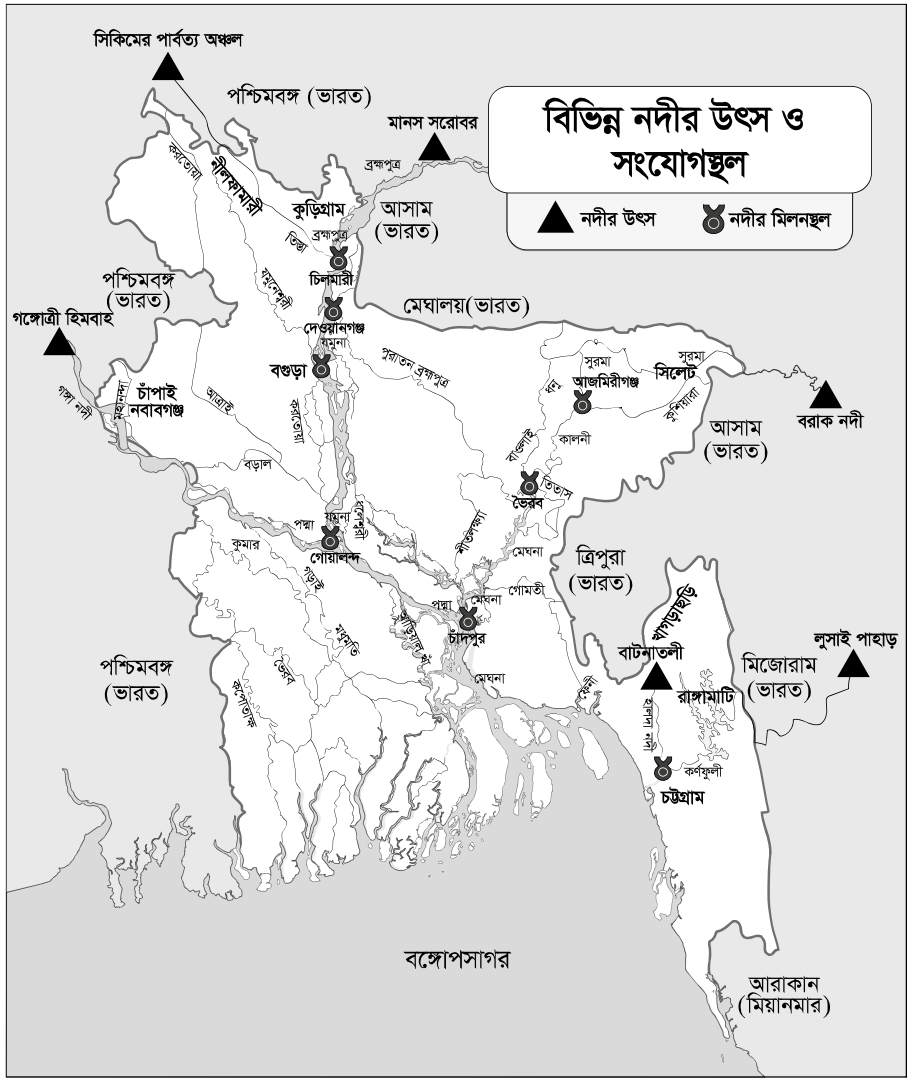

বাংলাদেশের নদ-নদী

পদ্মা অর্থনীতিতে নদীর গুরুত্ব

১। যোগাযোগ
২। নদীবন্দর: ৫৪টি
৩। সেবাকেন্দ্র
৪। মৎস্য
৫। চাষাবাদ — পানি
৬। পানি
৭। শিল্প
৮। পলি

ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নদ-নদীর প্রভাব

হিমালয় হতে উৎপন্ন নদীগুলোর বাহিত নরম পলি সঞ্চিত হয়ে এদেশের অধিকাংশ অঞ্চল সৃষ্টি বলেই নদী-মাতৃক পরিবেশ এদেশে সর্বত্র বিরাজমান। নদী এদেশের ভূমিকে করেছে সমতল ও উর্বর। নদী প্রবাহের ফলে পলি সঞ্চয়ে নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে পানি ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে নদ-নদীতে মাছ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। নদীর সাগরমুখী প্রবল ধারা কমে যাওয়ায় নদীর মোহনায় এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলোর মাটিতে লবণাক্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ বিলিন হয়ে যাচ্ছে। ভূমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় চাষাবাদের পরিমাণ কম হচ্ছে। নদীর মোহনায় অনেক নতুন নতুন চরের সৃষ্টি হচ্ছে।

নগরায়ণ সৃষ্টির ফলে খুব দ্রুত কলকারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলায় নদীর স্রোত কমে যাচ্ছে। ফলে স্রোতহীন নদীর পরিবেশ আরও দূষিত হচ্ছে। এতে পানি প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। নদীর মাছ মারা যাচ্ছে, মাছের বংশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। নদীর পানির ব্যবহার ও সেচ কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। জমিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক পদার্থ বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাথে মিশে নদীতে পতিত হচ্ছে। ফলে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এবং ছোট নদী গুলো শুকিয়ে যাওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চল মরুময় হচ্ছে। নদী ও ভৌগোলিক পরিবেশের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কৃত্রিম উপায়ে নদীর স্রোতের হ্রাস বৃদ্ধি বা প্রবাহের পরিবর্তন পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার বিঘ্ন ঘটায়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নদীর প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর উল্লিখিত নদীসমূহের প্রভাব অপরিসীম। সেচের পানি, শিল্পে ব্যবহৃত পানি ও জল বিদ্যুৎ শক্তির উৎস এসব নদী। তাছাড়া মাছের উৎসও হচ্ছে নদী। নদী আমাদের পরিবহন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান মাধ্যম। জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এসব নদী পলি বহন করে আনে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি বহুলাংশে নদীর উপর নির্ভরশীল বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ নদ-নদীর তীরবর্তী সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে। কেননা, নদ-নদী থেকে মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পানি পাওয়া নিশ্চিত থাকে। এছাড়া কৃষি কাজের জন্যে পানির জোগানও নদী থেকে দেওয়া সম্ভব। জীবনধারণের জন্য কৃষির পাশাপাশি মাছ শিকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও জনবসতি গড়ে ওঠার পিছনে নদ-নদীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পানির কারণেই মানুষ নদীর কাছাকাছি বসতি স্থাপন ও জীবিকা নির্বাহের উৎসের সন্ধান করেছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিস্তার সর্বাধিক ঘটেছে নদীগুলোর তীরে। ফলে অধিকাংশ শহর, গঞ্জ (বাণিজ্য) গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নদীর তীরে। এভাবে বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা, কর্ণফুলীর তীরে চট্টগ্রাম, শীতলক্ষ্যার তীরে নারায়ণগঞ্জ, সুরমার তীরে সিলেট, গোমতীর তীরে কুমিল্লা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

বঙ্গোপসাগর

➤ **অবস্থান:** বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তরের সম্প্রসারিত বাহু। ভৌগোলিকভাবে ৫° উত্তর ও ২২° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮০° পূর্ব ও ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ উপসাগরটি পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলংকার পূর্ব উপকূল, উত্তরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালি সৃষ্ট ব-দ্বীপ এবং পূর্বে মিয়ানমার উপদ্বীপ থেকে আন্দামান-নিকোবর শৈলশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ দ্বারা বঙ্গোপসাগর তিনদিকে আবদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমা শ্রীলংকার দক্ষিণে দন্দ্রা চূড়া থেকে সুমাত্রার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বমোট প্রায় ২২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ক্ষেত্রফলের বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত। এর গড় গভীরতা প্রায় ২,৬০০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,২৫৮ মিটার।

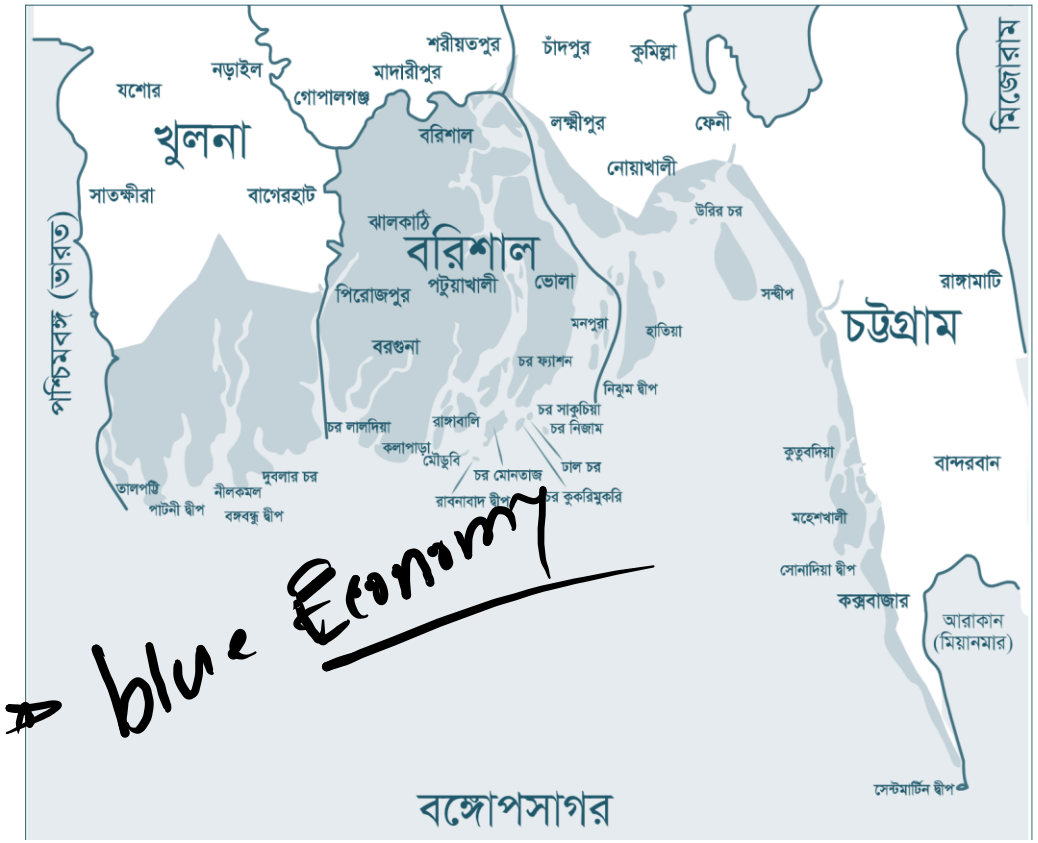

➤ **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মৎস্য, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবাল এবং ১৪০ প্রজাতির শৈবাল, ২১ প্রজাতির হাঙ্গর ও রে, ১ প্রজাতির স্কুইলা (মেন্টিস), ৫ প্রজাতির স্কুইড, ৪ প্রজাতির অক্টোপাস এবং ৫ প্রজাতির ক্যাটল ফিশসহ নানা আহরণযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে বঙ্গোপসাগর ভরপুর।

এই জৈব সম্পদ আহরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশালসংখ্যক জনসাধারণের খাদ্য ঘাটতি পূরণ, পুষ্টির চাহিদা মেটানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক খাত সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের অগভীর ও গভীর সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস মজুদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ইতোমধ্যে উপকূলবর্তী সাঙ্গু অববাহিকা থেকে গ্যাস উত্তোলন ও তা জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন শুরু হয়েছে।

বিত

৮:২৭ মুহ: রত

বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ

❑ প্রবাল দ্বীপ: সেন্ট মার্টিন

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ও মিয়ানমার-এর উপকূল হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে।

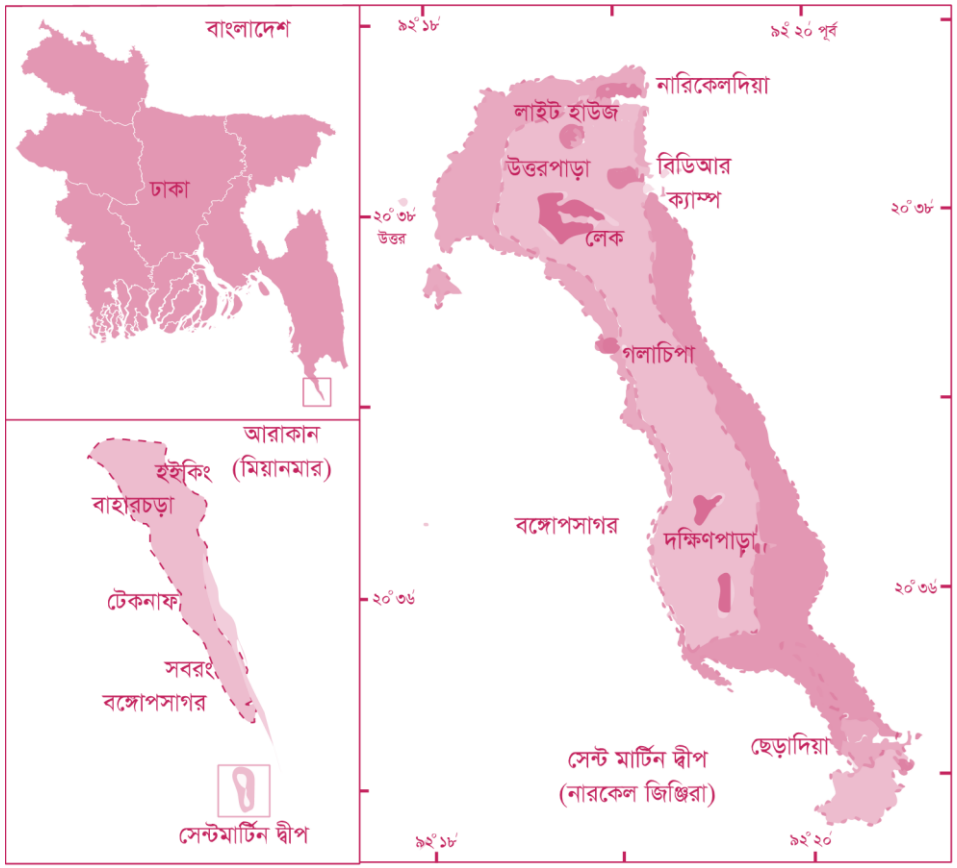

সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ দ্বীপের তিন দিকের ভিত শিলা যা জোয়ারের সময় তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় জেগে ওঠে। ভিত শিলাসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন হবে প্রায় ১০-১৫ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপের গড় উচ্চতা ৩.৬ মিটার।

সেন্টমার্টিনের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার প্রবাল প্রাচীর। এ দ্বীপটির প্রধান গঠন উপাদান হলো চুনাপাথর। দ্বীপটির উত্তর পাড়া এবং দক্ষিণ পাড়া দু'জায়গারই প্রায় মাঝখানে জলাভূমি আছে। এগুলো মিঠা পানি সমৃদ্ধ এবং ফসল উৎপাদনে সহায়ক। দ্বীপটিতে কিছু কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন হয়ে থাকে।

* [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

* USA

* [illegible]

[illegible]

বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ

সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রায় ৬৬ প্রজাতির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ১৫৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, ২৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী ও ১২০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শিল কাঁকড়া, সন্ন্যাসী শিল কাঁকড়া, লবস্টার ইত্যাদি। মাছের মধ্যে রয়েছে পরী মাছ, প্রজাপতি মাছ, বোল করাল,রাঙ্গা কই, সুঁই মাছ, লাল মাছ, উড়ুক্কু মাছ ইত্যাদি। সামুদ্রিক কচ্ছপ, সবুজ সাগর কাছিম এবং জলপাইরঙা সাগর কাছিম প্রজাতির ডিম পাড়ার স্থান হিসেবে জায়গাটি খ্যাত। বর্তমানে এখানে সাত হাজারেরও বেশি লোক বসবাস করে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান পেশা মাছ ধরা।

সেন্টমার্টিনের অর্থনীতি মূলত মৎস্য কেন্দ্রিক। অধিকাংশ লোকের পেশা হচ্ছে মাছ ধরা। আর সেই সূত্রে তাদের সমাজ প্রধানত জেলে সমাজ। কিছু লোক আবার সমুদ্র তল থেকে শৈবাল ও ঝিনুক সংগ্রহ করে তা পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারে রপ্তানি করে টাকা উপার্জন করে। সেন্টমার্টিনের অর্থনীতির আরেকটি উপাদান হচ্ছে নারিকেল। সম্পূর্ণ দ্বীপে রয়েছে প্রচুর নারিকেল গাছ। এসব নারিকেল তারা আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায়ও সরবরাহ করে। প্রকৃতি নিজের মতো করে সেন্টমার্টিনকে রাঙিয়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের বাহারি সংমিশ্রণে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশের মধ্যে সেন্টমার্টিন উজ্জ্বল এক সৌন্দর্যভাণ্ডার। নীল জলরাশি বেষ্টিত একখণ্ড সবুজ ভূ-খণ্ড মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেয় অপার সৌন্দর্যময়ী বাংলাদেশের কথা। সৈকতের শামুক-ঝিনুক, স্বচ্ছ পানির নিচে রকমারি শৈবাল আর সাগর তীরের ঝাউগাছ মিলে সেন্টমার্টিন যেন এক স্বর্গপুরী। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। সেন্টমার্টিন হচ্ছে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

প্রবাল দ্বীপ বাংলাদেশের ভূ-অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্য আহরণ, পর্যটন, চুনাপাথর আহরণসহ নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় প্রবাল দ্বীপকে কেন্দ্র করে। দ্বীপটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সমস্যা ও সম্ভাবনা

❑ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা

- জলবায়ু সংক্রান্ত সুবিধা
- কৃষি ক্ষেত্রে সুবিধা
- শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে সুবিধা
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব
- ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত সুবিধা
- যোগাযোগ সুবিধা
- প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
- বনজ ও মৎস্য সম্পদ

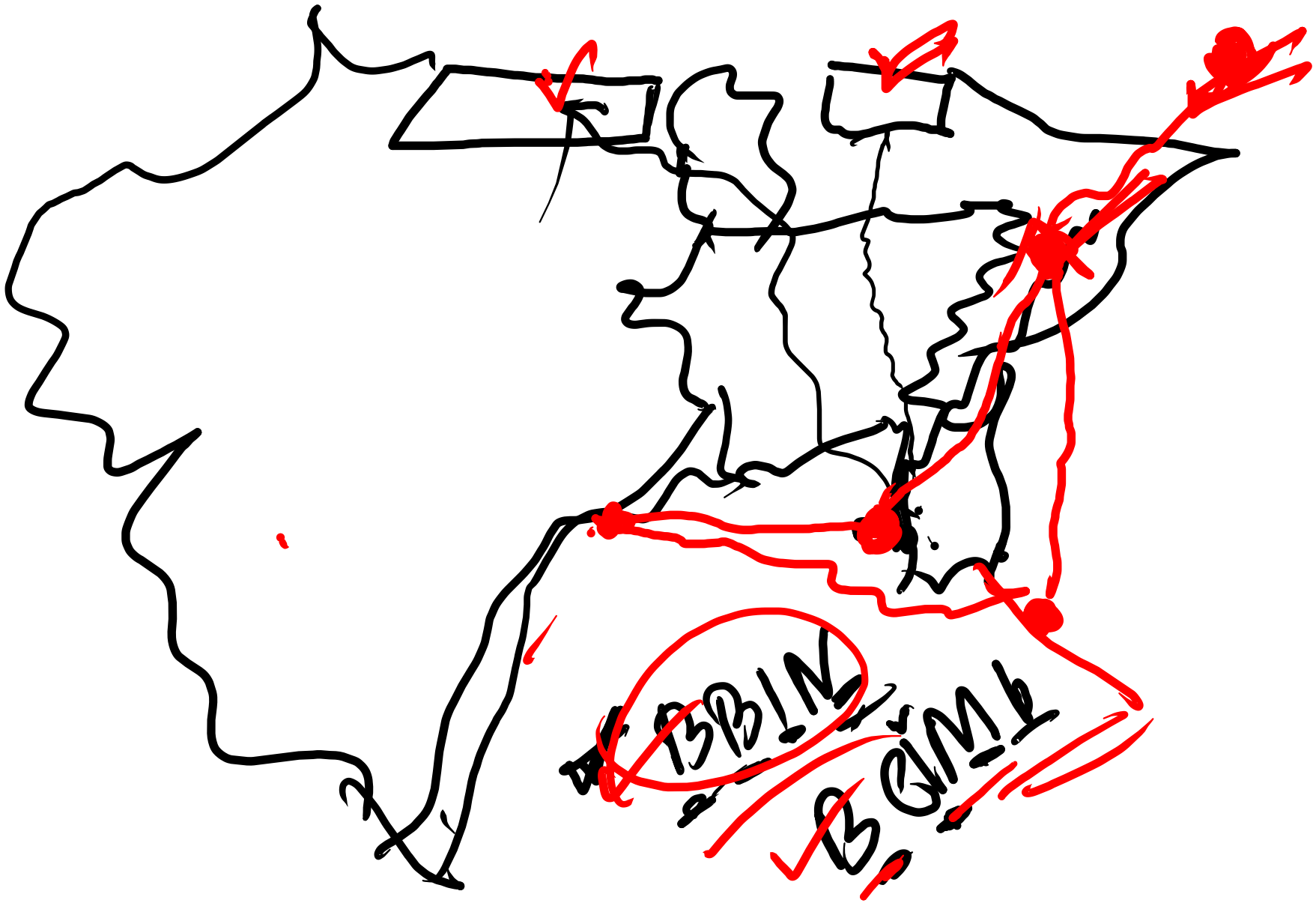

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সমস্যা ও সম্ভাবনা

❑ টেকটোনিক এক্টিভিটি

পৃথিবীর ভূত্বক বেশ কিছু টেকটোনিক প্লেট এর সমন্বয়ে গঠিত। প্লেটগুলো কঠিন মাটির স্তর যা ভূঅভ্যন্তরের অর্ধতরল ম্যাগমার উপর ভেসে চলে। প্লেটগুলোর আকৃতি মহাদেশের সমান বিশাল অথবা ছোট দ্বীপের মতো ক্ষুদ্র হতে পারে। প্লেটগুলোর সীমারেখা ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সীমানা সংঘর্ষ ভূমিকম্পের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সীমানাগুলোকে "ফল্টলাইন" বলে ডাকা হয়। এই ফল্টলাইন ধরেই পর্বত ও আগ্নেয়গিরি জেগে উঠতে দেখা যায়। ভূকম্পনের ঝুঁকি বিবেচনায় এই ফল্টলাইনগুলো সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়।

বাংলাদেশের ভূমিরূপে বিশেষ কোনও সাইজমিক ফল্টলাইন নেই। কিন্তু, দেশের সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভেতর বেঙ্গল ফ্যান এর ফল্টলাইন অথবা সীমান্তবর্তী জৈন্তাপাহাড় ফল্টলাইনগুলোর বিধ্বংসী ভূকম্পনের ইতিহাস আছে। এই ঝুঁকির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ভূ-প্রাকৃতিক ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অপরিকল্পিত নগরায়নের শক্তিশালী যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। ভূপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন মহাবিপর্যয় হয়ে উঠতে পারে। ২০১২ সালে (ভূমিকম্পে নয়) রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ার পর উদ্ধারকার্য চালাতে দেশের পূর্ণ সক্ষমতা নিবেদন করেও আড়াই মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভূমিকম্পে ধসে পড়া শহর পুনরুদ্ধারে আমরা একদমই প্রস্তুত নই। ভূ-প্রকৃতির ভবিষ্যৎ বিবেচনায় সাইজমিক এক্টিভিটি ও ভূমিকম্পকে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ দেওয়া দরকার। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল। একই মাত্রার আরেকটা ঘটনা সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে পারে। জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC, 2020) এর ১১ অনুচ্ছেদে ভূমিকম্প সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের গাইডলাইন দেওয়া আছে। বাস্তবে এই নির্দেশনা কতোটুকু মেনে চলা হচ্ছে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। অবকাঠামো নির্মাণে এই দিকটি আরও বেশি বিবেচনায় রাখা উচিত।

বাংলাদেশের বনভূমি

- **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ:** চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।
  গাছ: চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, সেগুন, গর্জন ইত্যাদি।

- **ক্রান্তীয় পাতাঝরা:** ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর, রংপুর।
  গাছ: শাল, গজারি, হিজল, নিম ইত্যাদি।

- **স্রোতজ:** নোয়াখালী, সুন্দরবন।
  গাছ: সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, গোলপাতা ইত্যাদি।

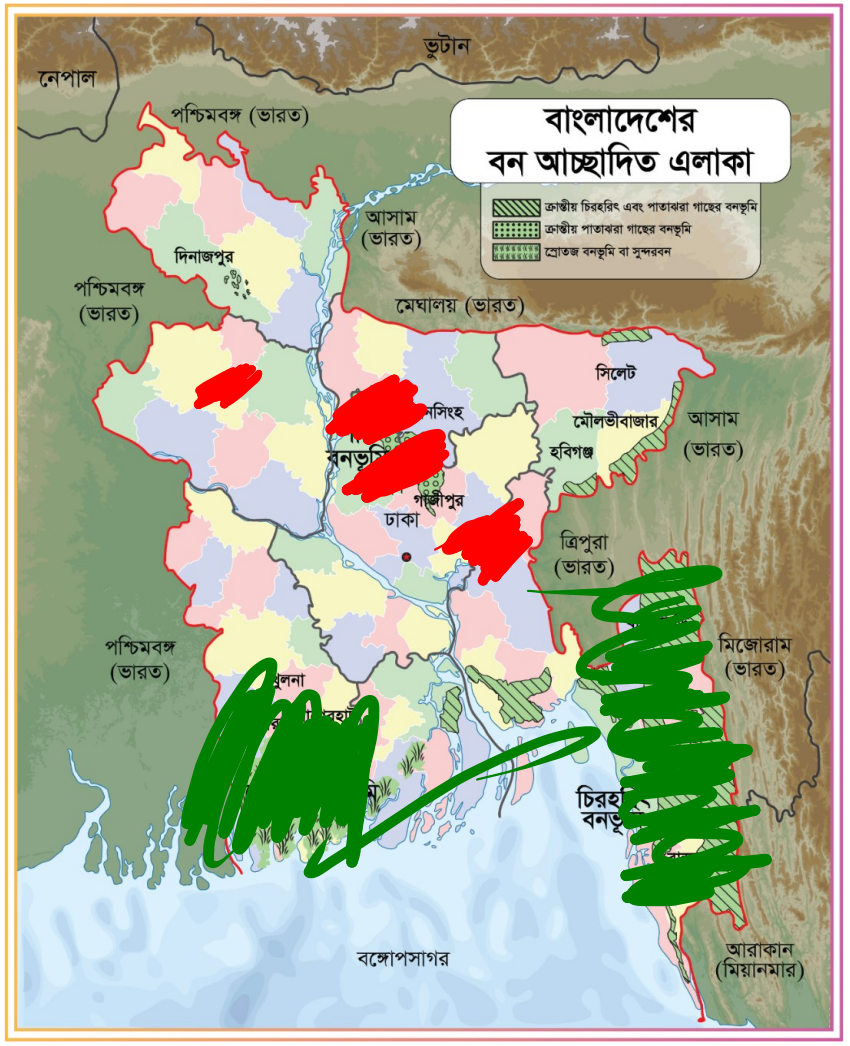

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

স্থলবন্দরের নাম	জেলা	সম্মুখবর্তী জেলা
বেনাপোল	যশোর	চব্বিশ পরগনা
টেকনাফ	কক্সবাজার	মংডু (মিয়ানমার)
বাংলাবান্ধা	পঞ্চগড়	জলপাইগুড়ি
সোনামসজিদ	নবাবগঞ্জ	মালদহ
হিলি	দিনাজপুর	পশ্চিম দিনাজপুর
ভোমরা	সাতক্ষীরা	চব্বিশ পরগনা
দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা	নদীয়া
বিরল	দিনাজপুর	গৌর
বুড়িমারী	লালমনিরহাট	মেখালজিগঞ্জ
তামাবিল	সিলেট	শিলং
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	তুরা
আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আগরতলা
বিবিরবাজার	কুমিল্লা	আগরতলা
নাকুগাঁও	শেরপুর	ডালু (মেঘালয়)
বিলোনিয়া	ফেনী	বিলোনিয়া
গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী	ময়মনসিংহ	গাছুয়াপাড়া (মেঘালয়)

- **৪৫তম বিসিএস:**
  (ক) ভৌগোলিক নির্দেশনা।

- **৪১তম বিসিএস:**
  (ক) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিজয়

- **৪০ তম বিসিএস:**
  (ক) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
  (খ) ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান ও এর ঝুঁকিসমূহ আলোচনা করুন।

- **৩৭ তম বিসিএস:**
  (ক) বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও এর সুবিধাবলি বর্ণনা করুন।
  (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর যে সকল বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের বিবরণ দিন।

৩৬ তম বিসিএস:

(ক) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে প্রবাল দ্বীপ এর গুরুত্ব কি?

(খ) বাংলাদেশের নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ সমূহ বলতে কি বুঝেন?

(গ) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বরেন্দ্র যাদুঘর এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩৫ তম বিসিএস:

(ক) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী?

(গ) বাংলাদেশের বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

❑ ধান:

- ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়।
- দেশের ৮০ ভাগ আবাদি জমিতে ধান চাষ হয় ধান চাষের জন্য ১৬° – ৩০° তাপমাত্রা এবং ১০০ – ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি প্রয়োজন।
- ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতকে উফশী বলা হয়। আশির দশক থেকে এদেশে উফশী ধানের চাষ জনপ্রিয় হতে শুরু করে।
- এদের মধ্যে, কাটারিভোগ ধান সবচেয়ে ভালো হয় দিনাজপুরে। বাংলাদেশের কাটারিভোগ ধান ১৭ জুন, ২০২১ এবং শেরপুরের তুলশী মালা ধান ১২ জুন, ২০২৩ সালে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- কালিজিরা ধান সবচেয়ে ভালো হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে।
- ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ ভারত। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয়। ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলা – ময়মনসিংহ।

❑ মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য

ধান	চাষের উপযোগী সময়	কাটার উপযোগী সময়	বিবরণ
আউশ	চৈত্র–বৈশাখ	আষাঢ়–শ্রাবণ	৮০–১২০ দিনের মধ্যে পাকে। একে আষাঢ়ী ধানও বলে। বৃষ্টি নির্ভর ধান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আউশ ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৩৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন।
আমন	শ্রাবণ–ভাদ্র	কার্তিক–অগ্রহায়ণ	আমন ধান মূলত দুই প্রকার যথা– (১) রোপা আমন ও (২) বোনা আমন। রংপুরে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমন ধান উৎপাদন হয় ১৭১.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন।
বোরো	কার্তিক মাস	জ্যৈষ্ঠ	প্রধানত সেচ নির্ভর ধান। সেচ জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে। একে বাসন্তিক ধানও বলা হয়। সিলেটে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত ধান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২২২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

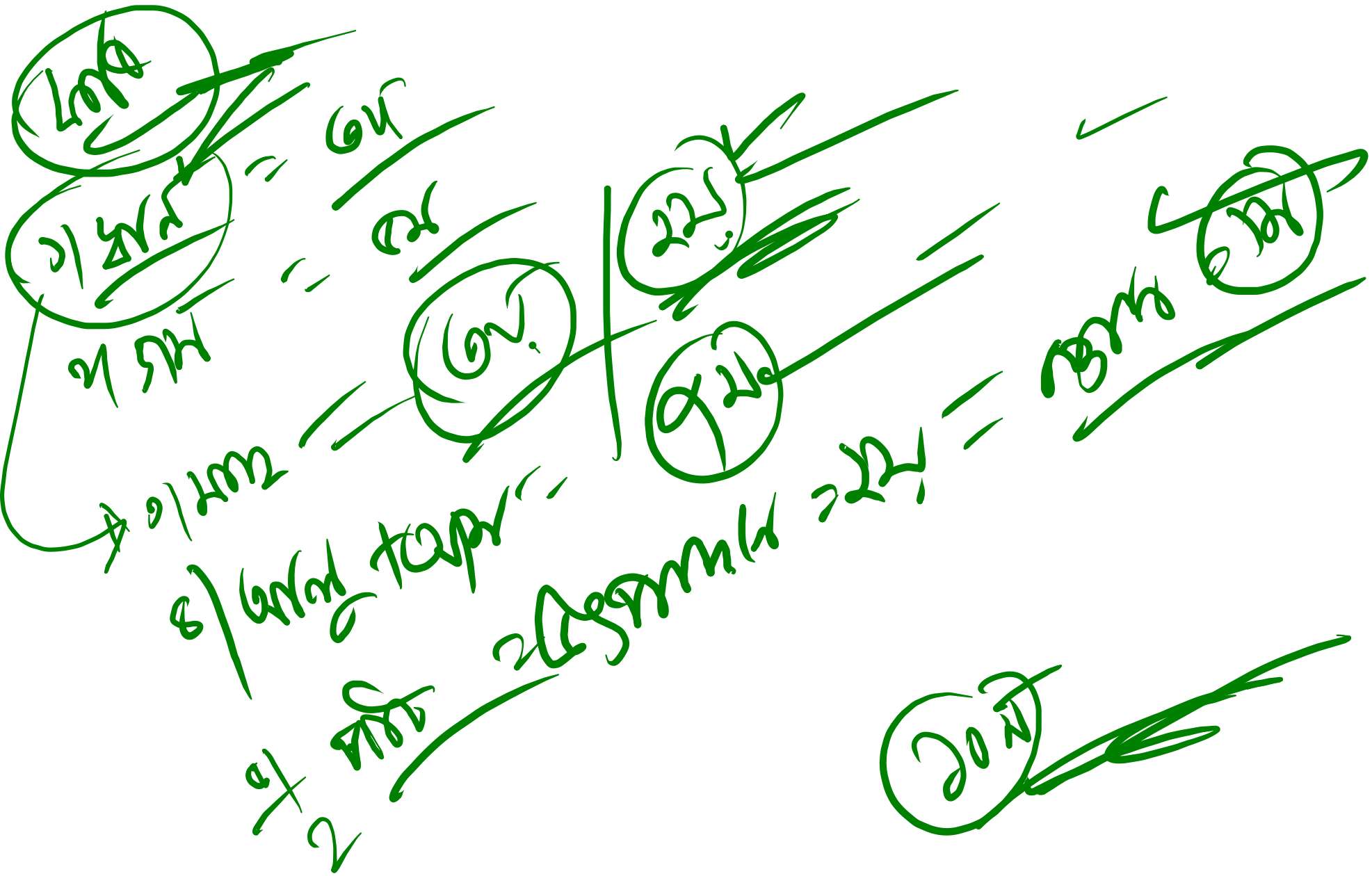

❑ **গম:** গম বাংলাদেশের শীত মৌসুমে উৎপন্ন হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানাদার ফসল। বাংলাদেশের আবহাওয়া গম ভালো হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

- দেশে বছরে মোট গমের চাহিদা ৩০–৩৫ লাখ মেট্রিক টন।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০২৪ অনুযায়ী দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট গমের উৎপাদন ১২.২৯ লাখ মেট্রিক টন।
- উচ্চ ফলনশীল গমের জাত 'শতাব্দী'। হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫৫ টন।
- বাংলাদেশের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়।

❑ পাট:

- পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। বায়ুর ৭০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার, চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাট বীজ বোনা হয়।
- পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ ভারত। রপ্তানিতে শীর্ষদেশ বাংলাদেশ।
- ১৯৫১ সালে মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৪৯টি পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে।
- বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম প্রথম ২০১০ সালের জুন মাসে পাটের Genome Sequence বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।
- দেশের উন্নতজাতের পাট হলো তোষা পাট এবং মেছতা পাট।
- পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৬ মার্চ, ২০১৭।
- সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর জেলায়।

❑ চা:

- ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়।
- চা গবেষণা কেন্দ্র ও চা মিউজিয়াম মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। চা বোর্ড অবস্থিত চট্টগ্রামে।
- চীন সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু করে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬৯টি চা বাগান রয়েছে।
- সবচেয়ে বেশি ৯২টি চা বাগান অবস্থিত মৌলভীবাজারে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় ২৫টি, সিলেট জেলায় ১৯টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২১টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ২টি, পঞ্চগড় জেলায় ৮টি, ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি ও খাগড়াছড়িতে ১টি (সর্বশেষ) চা বাগান আছে।
- চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং চা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কেনিয়া।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে পঞ্চগড় জেলায়।

❑ **ইক্ষু:** ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৩১ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৯ নভেম্বর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট। ইক্ষুর উন্নত জাতের মধ্যে ঈশ্বরদী–১/৫৩, ঈশ্বরদী– ২/৫৪, গেন্ডারিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- ➢ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা নাটোর।
- ➢ বর্তমানে বাংলাদেশে চিনির উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ টন।
- ➢ বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনিকল আছে।

❑ **রেশম:** বাংলাদেশে রেশম গুটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। রেশম চাষকে সেরিকালচার বলা হয়। রেশম পোকা মথ বা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

- ➢ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহীতে অবস্থিত।
- ➢ রেশমের ঐতিহ্যবাহী এবং অতি জনপ্রিয় শাড়ির নাম ‘গরদ’।
- ➢ রেশমের জন্য রাজশাহীকে সিল্ক সিটি বলা হয়।

❑ **তামাক:** তামাক বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। তামাক গাছ লম্বায় ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি (৩-৬ ফুট) হয়। রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে।

- তামাক গবেষণা কেন্দ্র রংপুরে অবস্থিত।
- সুমাত্রা ও ম্যানিলা তামাকের উন্নত জাত।
- অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তামাক চাষ করা হয়।

❑ **জুম চাষ:** জুম চাষ হলো পাহাড়ি এলাকায় এক ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকারের ফসলের বীজ বপন করা হয়। এটাই জুম চাষ বা স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি। জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি হলো– সল্ট পদ্ধতি। Slash and Burn হলো জুম চাষের অন্য নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% চাষীই জুমিয়া। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে জুম চাষ বেশি হয়। বছরে ২ বার জুম চাষ করা হয়। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে, পুড়িয়ে জুম চাষ করা হয়। এই পদ্ধতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

- জুম চাষের সাথে জড়িত জনগণ 'জুমিয়া' নামে পরিচিত।
- জুম পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল হলো ধান, তুলা, তিল, আদা ও হলুদ।
- বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর ভূমি এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন।
- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
- ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি।

স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন

সুন্দরবনের অপর নাম বাদাবন, একে উপকূলীয় বনও বলা হয়। এর মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার বা ২৪০০ বর্গ মাইল বাংলাদেশে অবস্থিত যা সুন্দরবনের ৬২ শতাংশের একটু বেশি। খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাব্যাপী সুন্দরবন অঞ্চল। একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি সুন্দরবন এবং পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, যার শ্বাসমূল রয়েছে। **এছাড়াও সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ হলো :** কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্ট ইত্যাদি। দুবলার চর মৎস্য আহরণ, শুটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত।

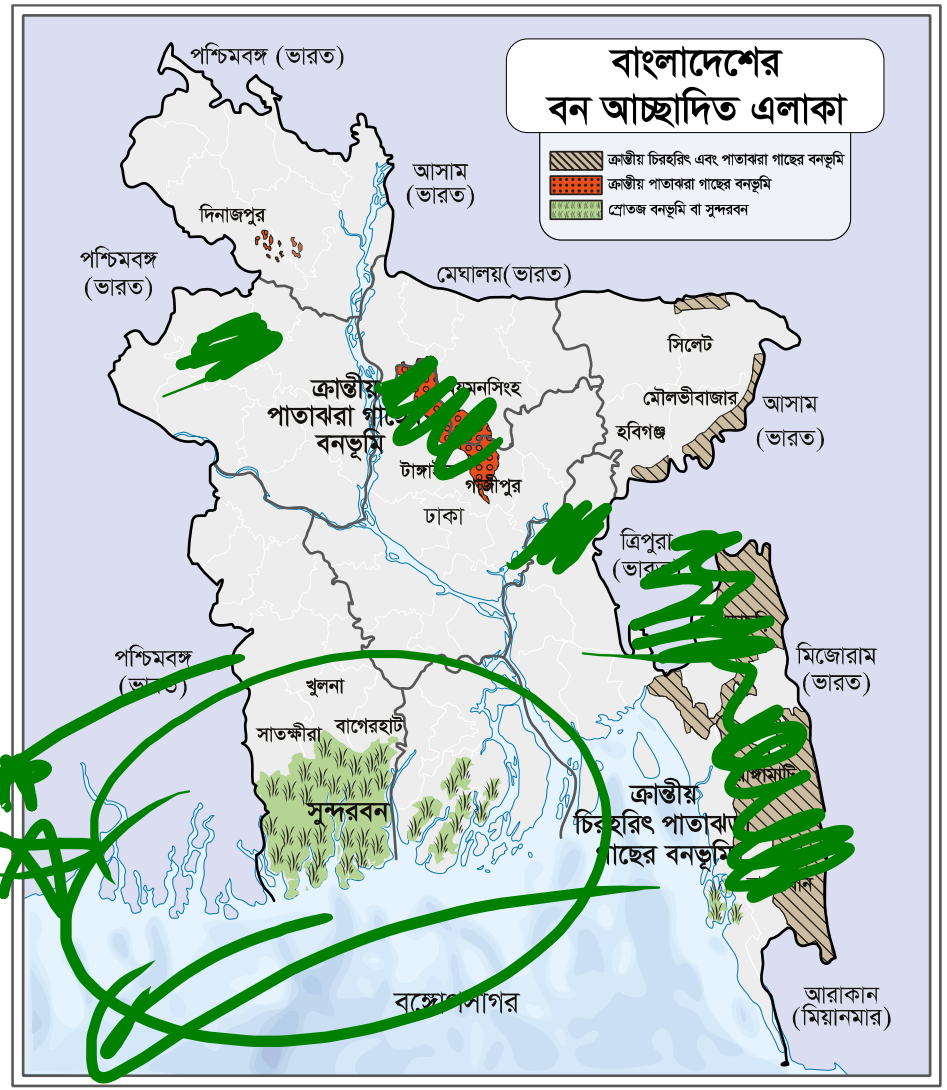

বনজ সম্পদ

সম্পদ: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরান, রাইন, ধুন্দল, আমুর, পাওর ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনাঞ্চলের সম্পদ। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর গোলপাতাও (Nipa palm) জন্মে। সুন্দরী বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার কারণে এই বনভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া এখান হতে মধু, মোম, শন ও ঔষধি গাছ সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, বানর, হরিণ, কুমির ও বিভিন্ন প্রকার পাখিও বনাঞ্চলের অবদান। সুন্দরবনে দুই ধরনের হরিণ পাওয়া যায়। যথা: মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ। আবার, এ বনে তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। যথা: কেটো কচ্ছপ, সুন্দি কচ্ছপ ও ধুম তরুণাস্থি কচ্ছপ। সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় ভাবে পরিচিত মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করে।

সুন্দরবনের নদীসমূহ : পশুর, শিবসা, রায়মঙ্গল, বালেশ্বর প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রধান নদী। পূর্বে বালেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী অবস্থিত। এছাড়া হাড়িয়াভাঙা নদী সুন্দরবন অংশে বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্ত করেছে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বাংলাদেশের মোট কাঠের ৬০% সুন্দরবনের গাছ হতে সংগৃহীত হয়।

নিচে সুন্দরবনের সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হলো:

- ✓ দেশের বেশিরভাগ কাঠ সুন্দরবনের গাছ হতে পাওয়া যায়।
- ✓ সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষ গৃহ ও নৌকা নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধুন্দল বৃক্ষ পেন্সিল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ গেওয়া বৃক্ষ নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনভূমি হতে প্রাপ্ত মধু এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি দেশের চিড়িয়াখানায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছের কাজ

গাছের নাম	ব্যবহার
সুন্দরী	▪ হার্ডবোর্ড, আসবাবপত্র, ঘরের দরজা ইত্যাদি তৈরি হয়। ▪ সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকার কদর রয়েছে।
গোলপাতা	▪ ঘরের ছাউনি তৈরিতে।
গরান	▪ ছোট নৌকার কাঠামো (পাজরা) তৈরিতে এই গাছের কাণ্ড ব্যবহার করা হয়। কাঠি, লাঠি, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ▪ গরানের কাঠ পুড়িয়ে ভালো মানের কয়লা তৈরি করা হয়।
ধুন্দল	▪ অপরিপক্ক ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে ভোজ্যতেল বের করা যায়। ▪ পেন্সিল তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
গেওয়া	▪ দিয়াশলাই কাঠি তৈরিতে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। এ গাছের গুড়ি দিয়ে ঢোল, তবলা, খোল প্রভৃতি তৈরি হয়। ▪ খুলনার নিউজ প্রিন্ট মিলের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
কেওড়া	▪ বাংলাদেশে প্যানেল বানানো, প্যাক করার বাক্স তৈরি, আসবাবপত্র ও জ্বালানির জন্য কেওড়ার কাঠ ব্যবহৃত হয়।

➢ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি

এ বনাঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমস্ত গাছের পাতা এক সাথে ঝরে না। ফলে বন সব সময় সবুজ থাকে। তাই একে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি বলে।

অবস্থান ও আয়তন: প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিয়দংশে এ বনভূমির বিস্তার। এ বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৯৪৭২ বর্গ কি.মি.। এটি বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনাঞ্চল।

বনজ সম্পদ: সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, জারুল, পাম, চিকরাশি, বৈলাম, ময়না, পিটালী ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমিতে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেত এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া বনাঞ্চলে নারকেল, জলপাই, কাঞ্চন, আমলকি ও বিভিন্ন ঔষধি গাছ জন্মে। বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আছে হাতি, হরিণ, চিতা বাঘ ইত্যাদি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- ✓ এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বাঁশ ও বেত দ্বারা সিলেট ও চট্টগ্রামে বাঁশ ও বেত শিল্প গড়ে উঠেছে।
- ✓ আসবাবপত্র, সেতু, রেলওয়ে স্লিপার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে জারুল, চাপালিশ প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ময়না, পিটালী প্রভৃতি কাঠ দিয়াশলাই এবং প্লাইউড কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত হরিণ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির চামড়া, শিং, দাঁত নানা প্রকার কুটির শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়।

➢ ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি

এরূপ বনভূমির বৃক্ষের পাতা প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টির অভাবে ঝরে যায় বলে এরূপ বনভূমিকে পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বলে। স্থানভিত্তিতে এ বনাঞ্চলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

- ✓ **মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি:** এ বনভূমি ৪৪০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত।
  সম্পদ: শাল, গজারি, কড়াই, কাঁঠাল, নিম, ঝিকা, বাজনা, বনজাম ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

- ✓ **রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি:** ৩৯ বর্গ কি. মি. আয়তনসম্পন্ন এ বনভূমি রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশে গড়ে উঠেছে।
  সম্পদ: এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল।

মৎস্য সম্পদ

২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থার (এফএও) মৎস্যসম্পদ বিষয়ক প্রতিবেদন 'ওয়ার্ল্ড স্টেট অব ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার - ২০২৪' অনুযায়ী মিঠাপানির মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান - দ্বিতীয়; চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান - পঞ্চম। মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম (সূত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়- ২০২৪)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপির চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, স্থির মূল্যে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৩৬%।

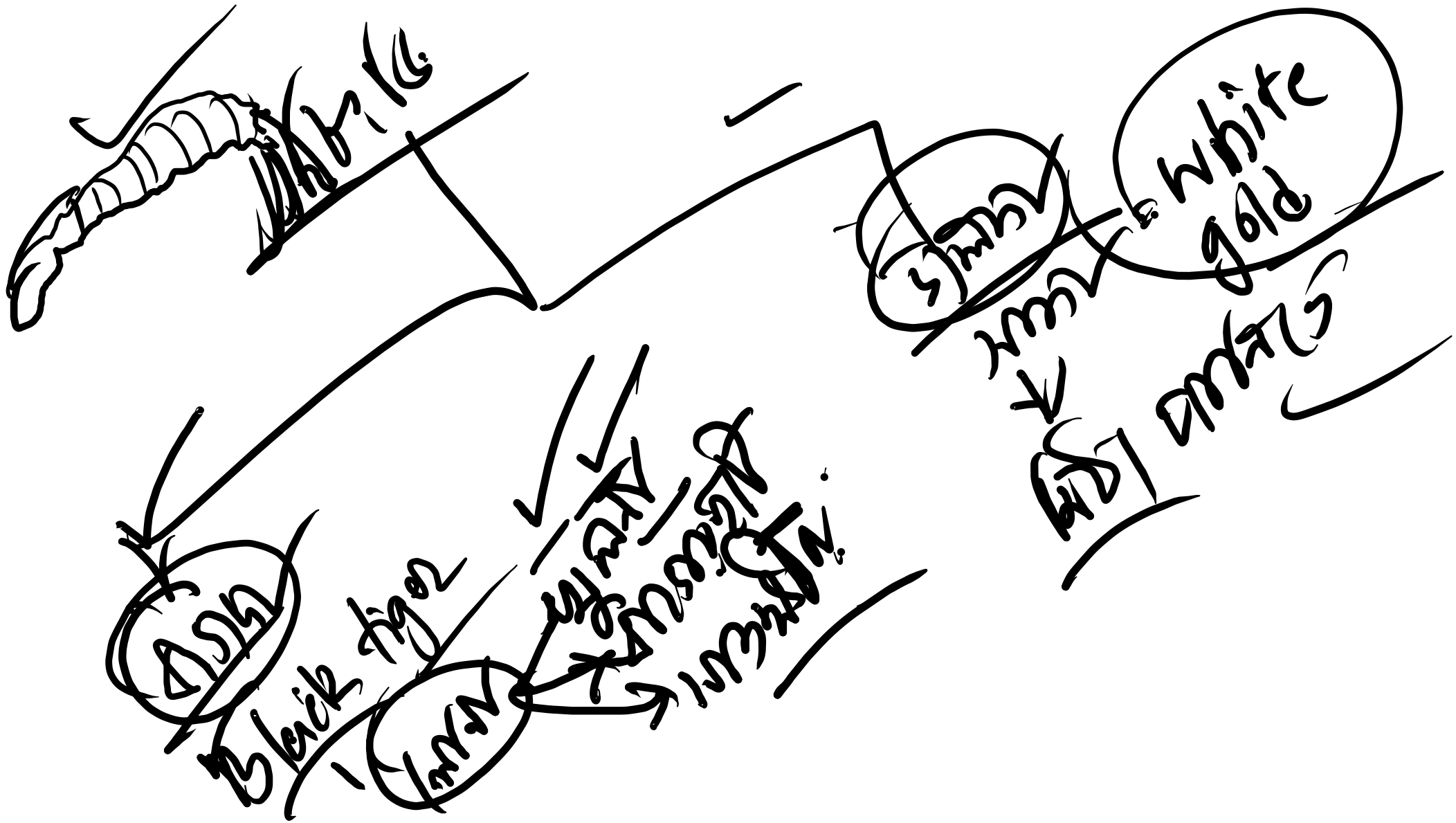

❑ ইলিশ

- বাংলাদেশে ইলিশ মাছ পণ্যের ওপর GI প্যাটেন্ট লাভ করেছে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম।
- বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬% বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের মোট মৎস্য রপ্তানি আয়ের প্রায় ১২% আসে ইলিশ থেকে।
- চাঁদপুর জেলাকে ইলিশের বাড়ি বলা হয়। এ অঞ্চলের ইলিশ খেতে সবচেয়ে সুস্বাদু। তবে, বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলায় সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা পড়ে (৩.৩২ লাখ মেট্রিক টন) ।
- দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি।
- ইলিশ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সরকারি পর্যায়ে বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন ঋতুতে প্রতিবছর ২২ দিন করে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে এবং নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা ধরা নিষেধ। বর্তমানে বাংলাদেশের ইলিশের অভয়াশ্রম ৬টি। ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের ইলিশকে জাটকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

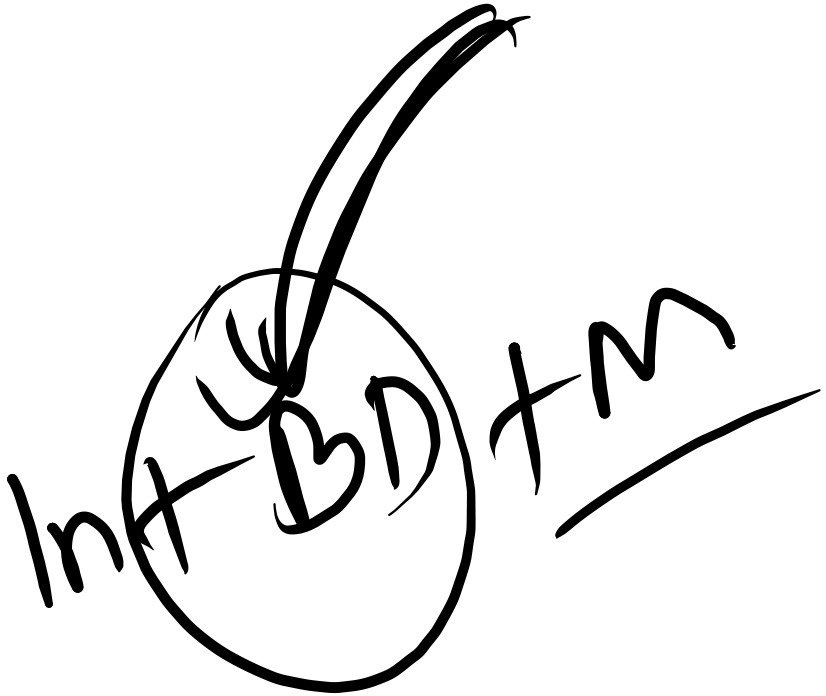
Int BD+M

চিংড়ি

- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয়।
- বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। সত্তর দশক থেকে বাগদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
- বাগদা চিংড়ি রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় আশির দশক থেকে।
- বৃহত্তর খুলনা চিংড়ি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে চিংড়ি মাছের চাষ। বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে চাষ করা হয় এবং গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে চাষ করা হয়।
- বাগদা চিংড়ি 'ব্লাক টাইগার' নামে পরিচিত।

❑ মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- **মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন:** বর্তমানে মৎস্য চাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেণু/পোনা। তবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডফিস উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে।

- **জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি:** বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.১৫ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ; বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে পরিচিত। সরকার এ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ।

সরকার ইলিশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো:

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ(Vulnerable Group Feeding) খাদ্য সহায়তা প্রদান।
- জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ।
- নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন।
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন।
- পদ্মা, মেঘনার ঊর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ।
- জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা:** সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। সামুদ্রিক প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায়। সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশ সাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০' গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা' ও 'সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা-২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর. ভি মীন সন্ধানী' এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে এবং সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প-এর আওতায় আরও ১৬টি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ করা হবে। ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইকোফিশ প্রকল্পের সহায়তায় হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা MPA (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কক্সবাজারের কলাতলীতে কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা, টেকনাফ, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ০.৮ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড ও ওয়েস্টার কালচার পাইলটিং করা হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫২ টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রধান বাজার। বর্তমানে মোট ১০৫টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা লাইসেন্সভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩টি EU ভুক্ত দেশসমূহে মৎস্য রপ্তানি করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৬৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ৬৯,৮৮১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ৪৭৯০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২৪ পর্যন্ত ৪৭৩৭৬.৭৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ২৮৭৮.৯১ কোটি টাকা।

প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত প্রাণিসম্পদ। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি এদেশের প্রাণিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ পরিবহন, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে এর অবদান ছিল শতকরা ১.৬৬ ভাগ। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির ১.৯০ শতাংশ প্রাণী সম্পদ থেকে আসে। গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২তম। বাংলাদেশ থেকে মাংস ও পশুপণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে।

বিভিন্ন অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
দুধ (লক্ষ মে. টন)	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮	১০৬.৮৯
মাংস (লক্ষ মে. টন)	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০	৬৪.৪২
ডিম (কোটি)	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	১৫৮৬.৩২

[তথ্যসূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত]

খনিজ সম্পদ

❑ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ

❑ বাংলাদেশের প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১ শক্তিসম্পদ

২ ধাতব খনিজ

৩ অধাতব খনিজ

শক্তিসম্পদ

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস (ii) কয়লা (iii) খনিজ তেল

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ পূরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (CH_4), যার পরিমাণ ৮০-৯০ শতাংশ। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৪০.৫৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে ২০২৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৩ লাখ।

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০২২-২৩)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	গ্যাস ব্যবহারের হার
১	বিদ্যুৎ	৪২%
২	শিল্প	১৯%
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৮%
৪	গৃহস্থালি	১১%
৫	সার কারখানা	৫%
৬	সিএনজি	৪%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২৪]

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১০০২.৬ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত এলএনজি (আরএলএনজি) সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১০০২.৬ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ৯৩২.৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে।

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জানুয়ারি ২০২৪) পর্যন্ত উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ৯৬.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৭২০.৩৯ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, বর্তমানে অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকটি স্থানে লিগনাইট ও বিটুমিনাস শ্রেণির কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলো থেকে এখনও উত্তোলন শুরু হয়নি।

খনিজ সম্পদ

প্রাপ্তিস্থান: রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের লালঘাট, টাকেরহাট, ভাঙ্গারঘাট প্রভৃতি। ফরিদপুরের বাগিয়া ও চান্দাবিল, খুলনার কোলাবিল ও সিলেটে কিছু পীট কয়লা পাওয়া গিয়েছে।

কয়লার ক্ষেত্র	সঞ্চিতির পরিমাণ
১. বড়পুকুরিয়া	৪১০ মিলিয়ন মে.টন
২. দীঘিপাড়া	৭০৬ মিলিয়ন মে.টন
৩. ফুলবাড়ি	৫৭২ মিলিয়ন মে.টন
৪. খালাসপীর	৬৮৫ মিলিয়ন মে.টন
৫. জামালগঞ্জ	৫৪৫০ মিলিয়ন মে.টন
মোট	৭৮২৩ মিলিয়ন মে.টন

[উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ]

বিদ্যুৎ সম্পদ

- বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ৩০০৬৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৬০২ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.৪৩ লক্ষ কিলোমিটারে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সিস্টেম লস ৮.৯০ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৩ শতাংশ।

- বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১৫০ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২৮ বিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ৩.৫২ মিলিয়ন টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৮ ও ৬২মিলিয়ন লিটার।

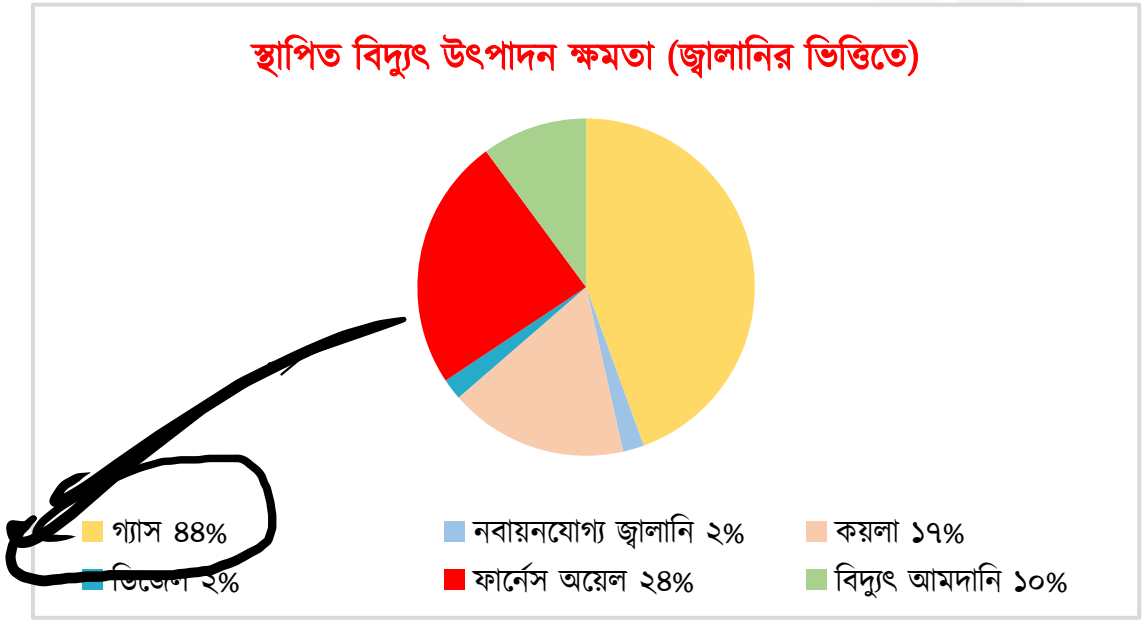

মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৬,৮৪৪ মেঃ ওঃ

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ, জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত*

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো –

- ✓ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস)
- ✓ ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- ✓ খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ✓ বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ✓ মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- ✓ রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৃতি	প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র	অবস্থান
পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	নরসিংদী সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	করিমপুর ও নজরপুর, নরসিংদী
গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিলেট
কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র / তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বড় পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বড় পুকুরিয়া, দিনাজপুর
বায়ু বিদ্যুৎ	বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প	সোনাগাজী, ফেনী

মানবসম্পদ উন্নয়নের নির্ধারকসমূহ

- জীবন প্রত্যাশা/ গড় আয়ু
- মাথাপিছু আয়
- শিক্ষার হার
- সামাজিক নিরাপত্তা
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো
- দরিদ্রতা

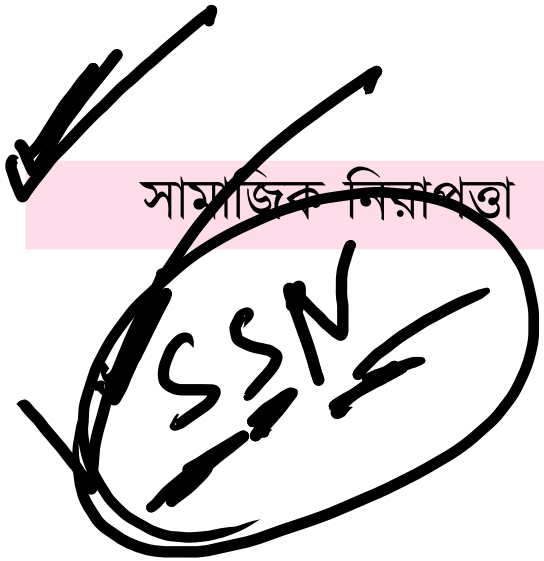

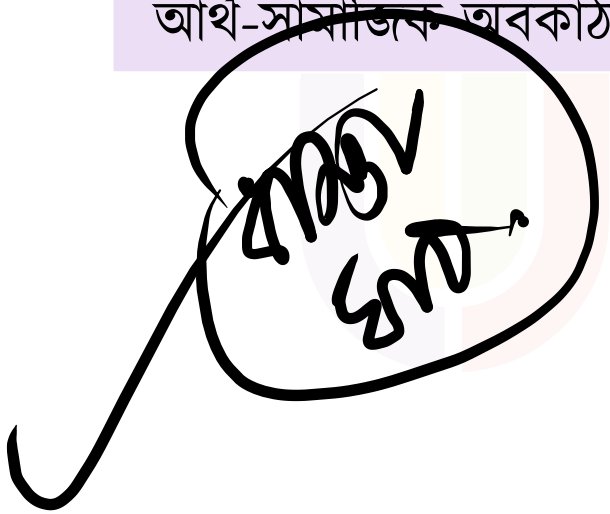

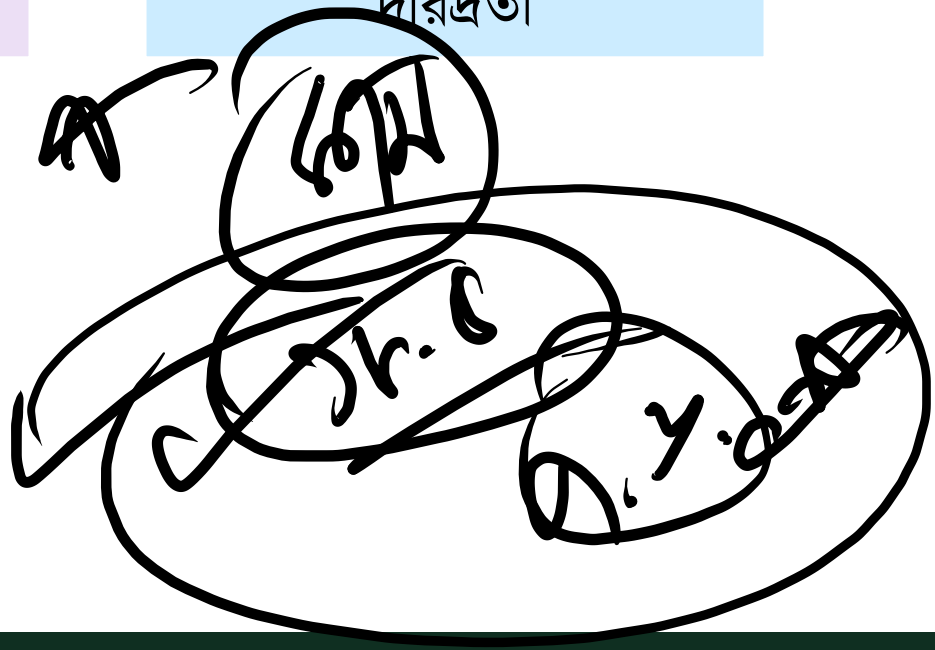

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ

- **শিক্ষার উন্নয়ন:** শিক্ষার উন্নয়নে সরকার নিম্নের পদক্ষেপ নিয়েছে-

✓ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০	✓ কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা	✓ নতুন বই বিতরণ
✓ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	✓ আইসিটি এর ব্যাপক ব্যবহার	✓ উপবৃত্তি প্রদান
✓ ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদান।		

- **নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম:** রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ও বিধিমালা ২০১৮, শিশু একাডেমি আইন ২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :** সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতিদিন ৬০০০-৮০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও সরকার করোনা মোকাবেলায় টিকা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি EPI ভুক্ত ১০টি টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার ফলে শিশু মৃত্যু হার হাজারে-২১ জন ও মাতৃ মৃত্যুহার লাখে- ১৬৫ জনে নেমে এসেছে। জনগণের গড় আয়ু বেড়ে ৭২.৩ বছর হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ :** দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নানান প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রেখেছে। এর মধ্যে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি রয়েছে।

- **দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি :** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, আশ্রয়ণ প্রকল্প, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- **ডিজিটাল বাংলাদেশ :** ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকার ডিজিটাল মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রণোদনা প্রদান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবসম্পদ গঠন ইত্যাদি।

- **যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন :** যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগী কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

- **সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :** দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনি এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

- **করোনার টিকা প্রদান :** কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে www.surokkha.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বয়স ও প্রাধিকার ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২ পর্যন্ত ২ ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১২,১৪,২৫,৫৩৯ জন এবং ৩য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪,৪৪,৫১,৯৫৫ জন।

❖ **মানবসম্পদ উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের গতিধারা**

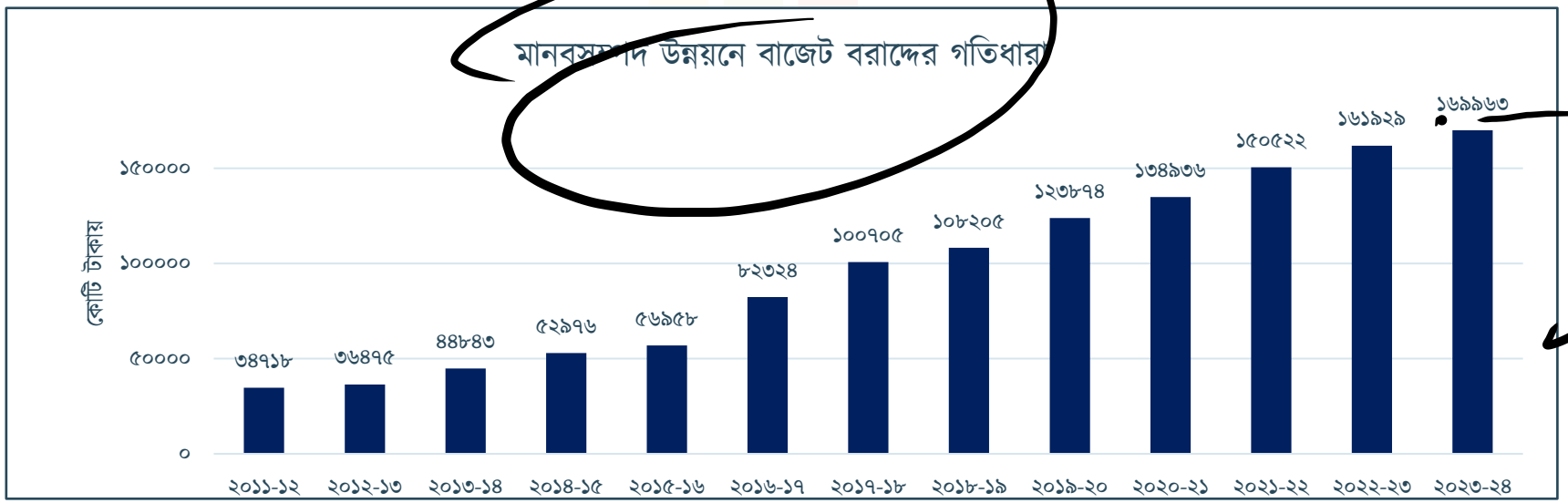

[তথ্যসূত্র : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়]

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

বাজেট বরাদ্দ: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট বাজেট ৭,৯০,০০০ কোটি টাকা।

জনপ্রশাসন খাত	শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত	পরিবহন ও যোগাযোগ
১,৮৬,০৮৮ কোটি টাকা	১,১০,৬৫৭ কোটি টাকা	৭১,৩৪৪ কোটি টাকা
মোট বাজেটের ২৩.৫৬%	মোট বাজেটের ১৪.০০%	মোট বাজেটের ৯.০৩%

২০২৫-২৬ বাজেটে খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে- ২,৩০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

২. শিক্ষার উন্নয়ন :

- ✓ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা।
- ✓ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।
- ✓ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬৪.৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- ✓ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- ✓ সরকার এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদা ভিত্তিক সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৬৪ জেলা), মৌলিক সাক্ষরতাপ্রকল্প (৬৪ জেলা), সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে লেখাপড়া ও হিসাব নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

৬. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন : অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ১০ হাজার ৬০২ কোটি টাকা (মাদ্রাসা শিক্ষাসহ) বরাদ্দ করেছে।

৭. স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন :

- ✓ জনস্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকার জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি- ৪) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা।
- ✓ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- ✓ বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে।
- ✓ করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সংক্রমিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন :

- ✓ নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ✓ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন- ২০১০'।
- ✓ শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮'।
- ✓ এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❖ জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

➲ জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক **রবার্ট ম্যালথাস**।

➲ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মতে, জনসংখ্যা **বাড়ে জ্যামিতিক হারে**। যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি। আর, খাদ্য উৎপাদন **বাড়ে গাণিতিক হারে**। যেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি।

❖ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (জনমিতিক লভ্যাংশ)

একটি দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ যদি কর্মক্ষমহীন জনসংখ্যার তুলনায় বেশি হয় তাহলে এই অবস্থাটাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ বলে। একটি দেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সী মানুষের হার ৫০% এর বেশি হলে সেই দেশকে জনসংখ্যার বোনাসকাল বলে। বাংলাদেশ ২০১২ সালে এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ২০০৭ সালে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬১ শতাংশের বয়স এই সীমার মধ্যে ছিল যা বর্তমানে প্রায় ৬৮ শতাংশ। কর্মক্ষম মানুষের এই আধিক্য ২০৩৮ সাল পর্যন্ত বজায় থেকে এর পর কমতে থাকবে। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সকে কর্মক্ষম বয়স হিসেবে ধরা হয়। এই শ্রমশক্তির উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

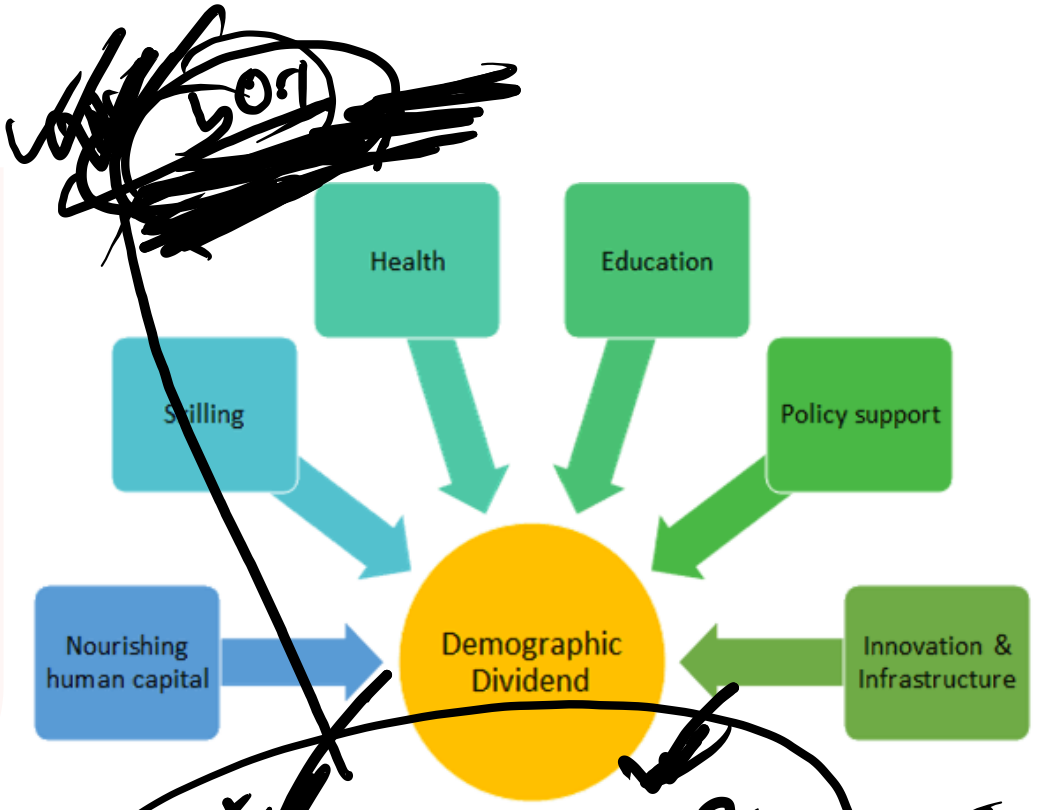

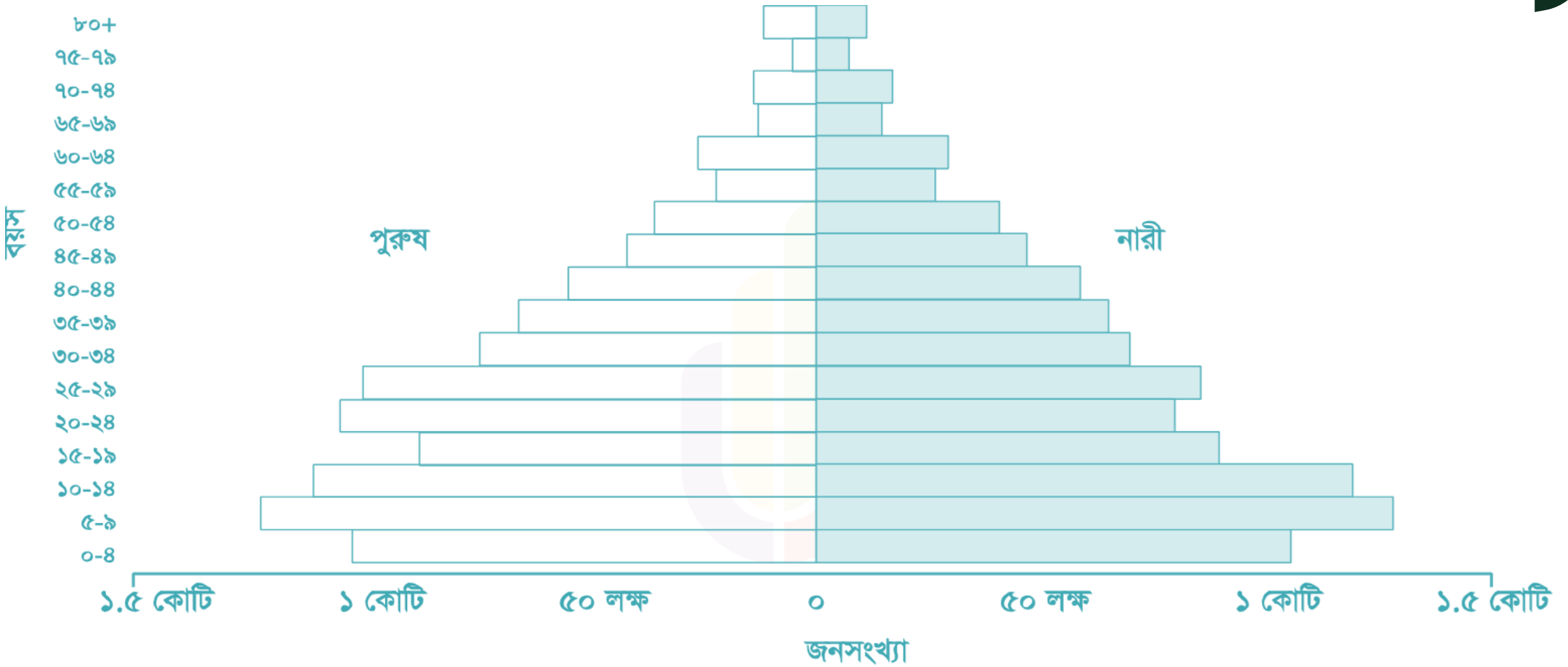

বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাপ

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্বের সূত্র, } DP = \frac{TP}{TA}$$

এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population); TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population); TA = মোট আয়তন (Total Area)

সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে মোট জনসংখ্যার সাথে মোট আয়তনের অনুপাতকে বোঝায়। কোনো দেশের ঘনত্ব দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জমির উর্বরতা, শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ও পরিবহণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিমাপ: ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন এবং আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এ তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে -

DP $\frac{১৬,৫১,৫৮,৬১৬}{১,৪৭,৫৭০}$ = ১১১৯ জন। অর্থাৎ, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১১৯ জন লোক বাস করে।

জন্মহার

$$\text{জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

মৃত্যুহার

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্য সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুরহার}}{১০০০} \times ১০০$$

বাংলাদেশে জনশুমারির ঐতিহাসিক পরিক্রমা

সাল	জনসংখ্যার পরিমান (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	৭.১৪৮	২.৪৮
১৯৮১	৮.৭১২	২.৮৪
১৯৯১	১০.৬৩	২.০১
২০০১	১২.৪৩	১.৫৮
২০১১	১৪.৪০	১.৪৬
২০২২	১৬.৫২	১.২২

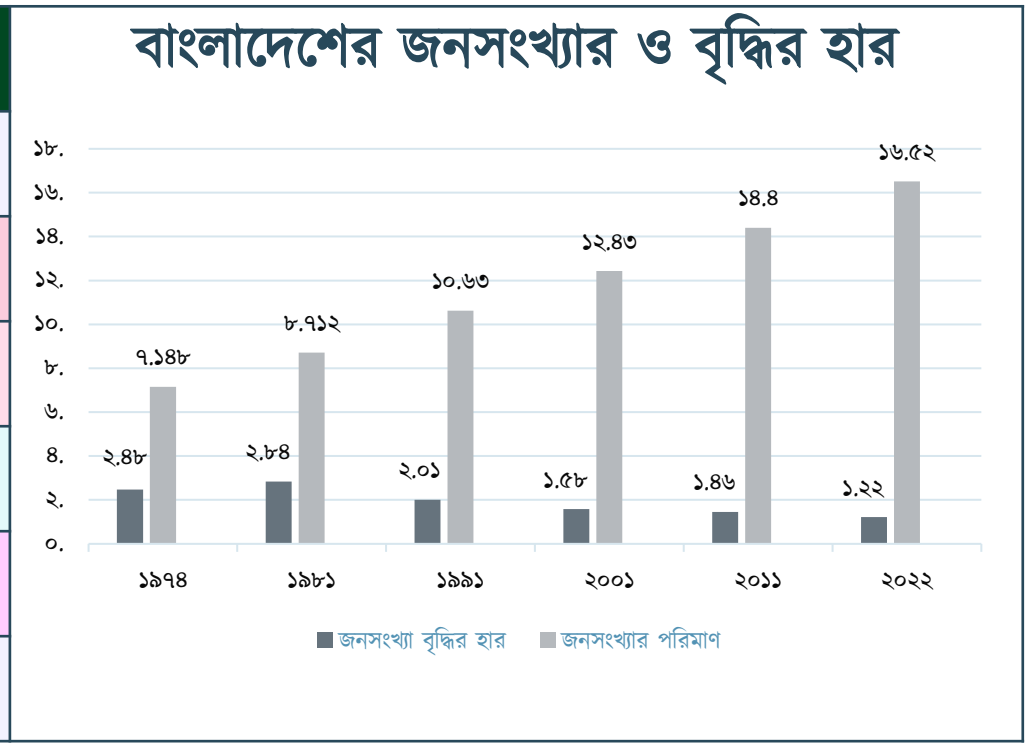

[তথ্যসূত্র : বিগত আদমশুমারি এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২]

বাংলাদেশে আগত জাতিগোষ্ঠীসমূহ

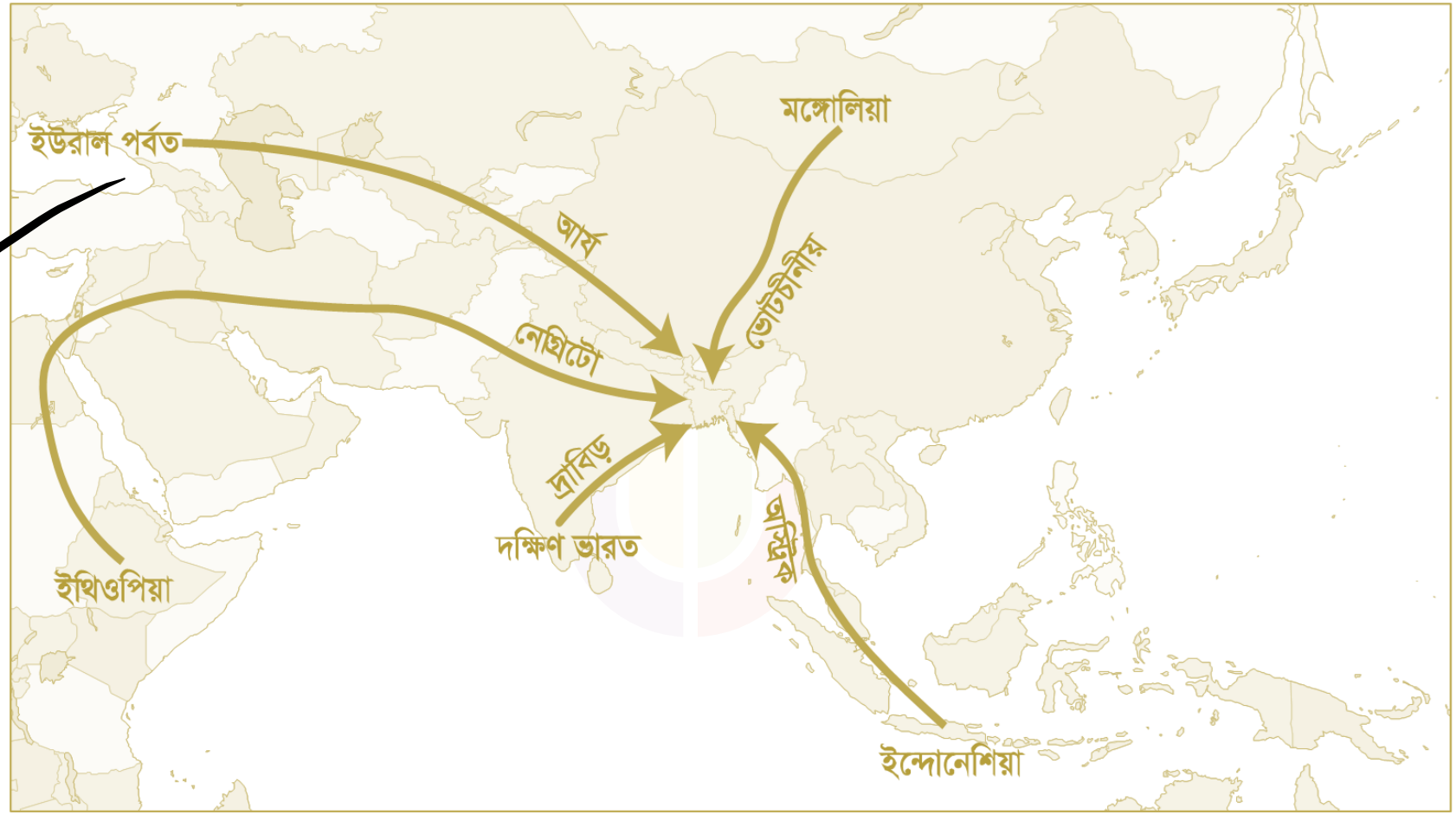

১০০০

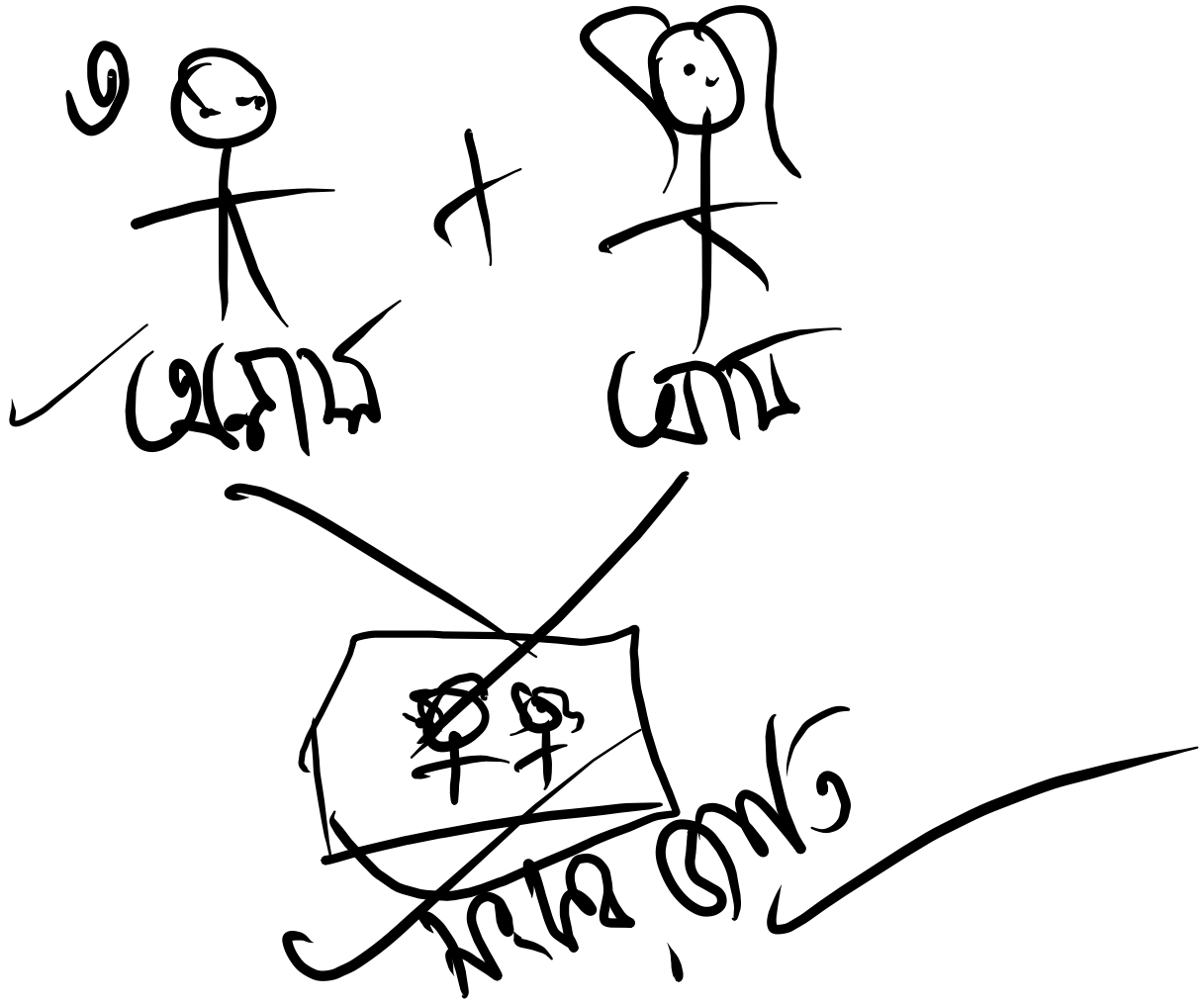
ও
+
প্রেম
ক্রোধ
ঘৃণা
সমান ভাগে

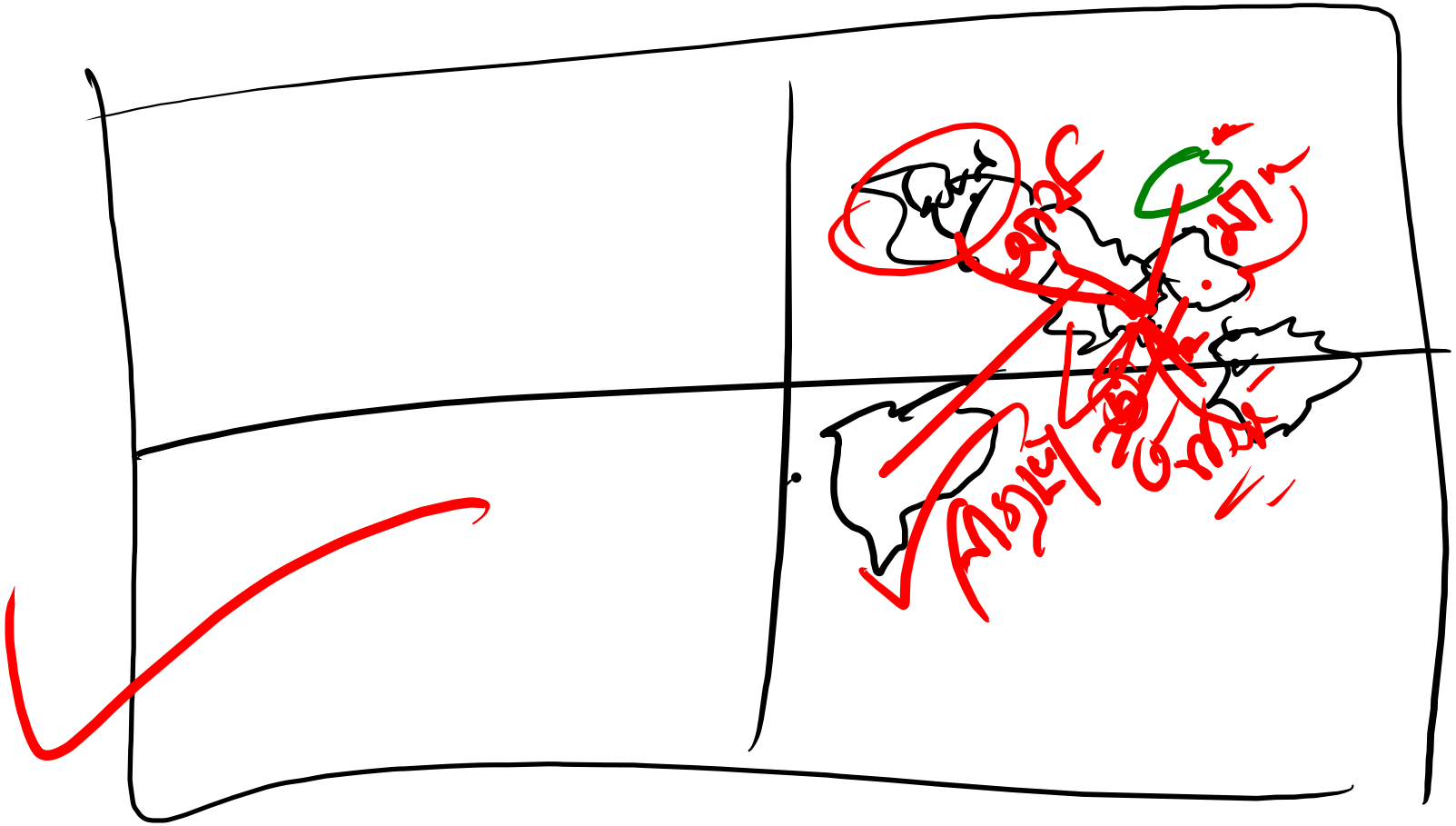

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

উপজাতিদের অবস্থান

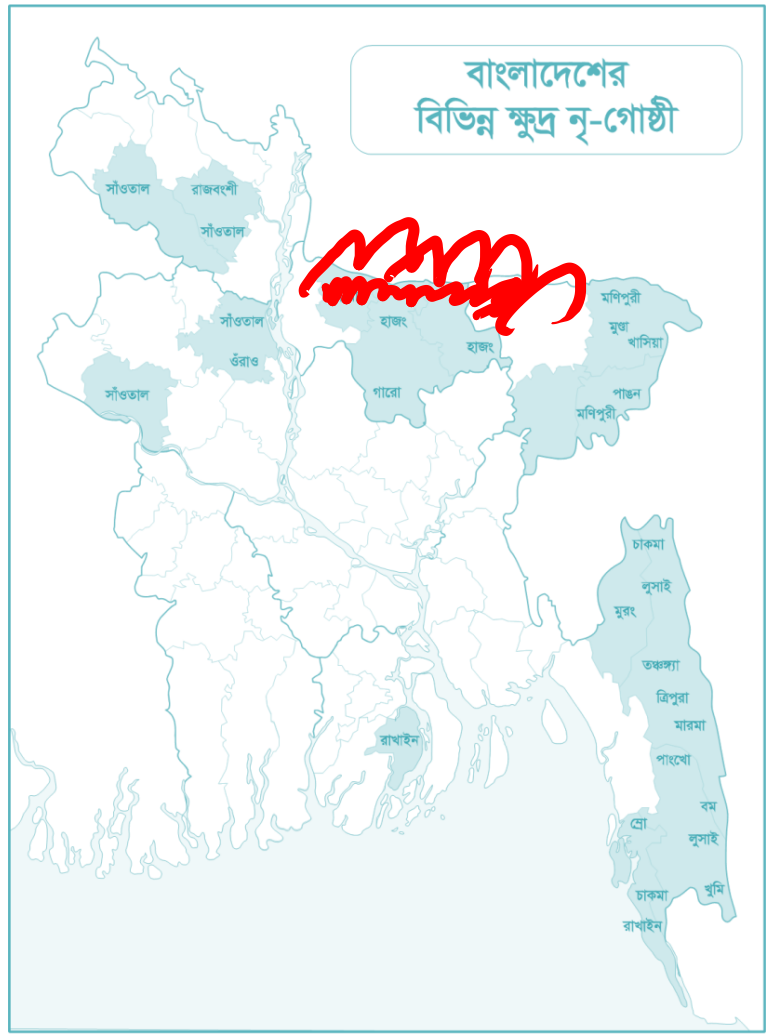

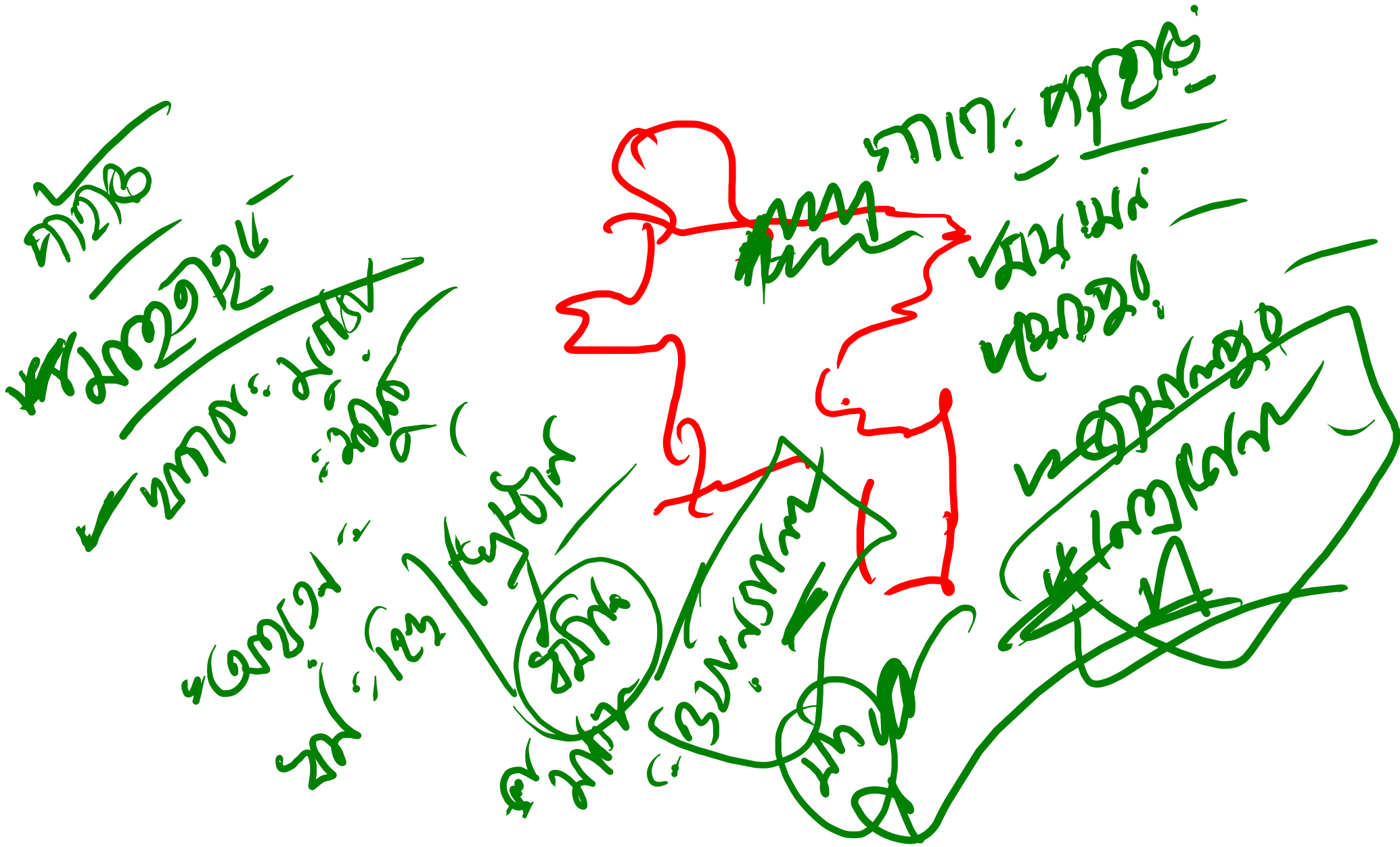

চাকমা

জনসংখ্যা - ৪,৮৩,২৯৯ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার।

ইতিহাস - ১৫৫০ সালের একটি পর্তুগিজ মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর তীরে চাকমা বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরও আগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত মত হলো চাকমা জাতিগোষ্ঠী মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে আদি নিবাস স্থাপন করেছিল।

রাজনৈতিক সংগঠন - ১৭৮৭ সালে কোম্পানির সাথে চাকমা রাজা জানবক্স খানের চুক্তি অনুযায়ী চাকমা অঞ্চল বৃটিশ কোম্পানির অধিভুক্ত না হয়ে ট্রিবিউটারি হয়ে থাকার সুযোগ পায়। ১৮৫৭ সালে কোম্পানি থেকে বৃটিশ রাজার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে চাকমা এলাকা আরও বিস্তৃত করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে (চাকমা, মং ও বোমাং) ভাগ করা হয় যেখানে চাকমাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল।

ধর্ম - বৌদ্ধ (আদি থেরবাদী ও বর্তমান মহাযানী বৌদ্ধত্ব)

ভাষা - চাঙমা বা চাকমা ভাষা। নিজস্ব লিপি আছে। ইউনিকোডে লেখা যায়।

উৎসব - বিজু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ঘরে ঘরে চাকমাদের মধ্যে গঙ্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজার প্রচলন রয়েছে। গোজেন নামের ঈশ্বরকে তারা খুব ভক্তি করে। তারা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও ফসল রক্ষার জন্য মোরগ ও শূকর বলিদান করে পূজা অর্চনা করে। চাকমাদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মাঘীপূর্ণিমা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়।

সাঁওতাল

জনসংখ্যা - ১,২৯,০৪৯ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)
বসতি - রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া।
ধর্ম - সনাতন ও খ্রিষ্টান
উৎসব - সান্দ্রে, সোহরাই

তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রায় প্রতিমাসে বা ঋতুতে রয়েছে পরব বা উৎসব যা নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নববর্ষের মাস ফাল্গুনে যেমন অনুষ্ঠিত হয় স্যালসেই উৎসব, তেমনি চৈত্রে বোঙ্গাবোঙ্গি, বৈশাখে হোম, আশ্বিনে দিবি, পৌষ শেষে সোহরাই উৎসব পালিত হয়। সোহরাই উৎসব সাঁওতালদের একপ্রকার জাতীয় উৎসব যা পৌষ সংক্রান্তির দিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

মারমা

জনসংখ্যা - ২,২৪,২৬১ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি।

ধর্ম - বৌদ্ধ

উৎসব - তাদের নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানকে সাংগ্রাই বলা হয়।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধ বিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধভিক্ষু "ভান্তেদের" অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোতে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের বন্দনা করে থাকে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মত মারমারাও Theravada Buddhism-এ বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করে থাকে।

রাখাইন

জনসংখ্যা - ১১,১৯৫ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা।

ধর্ম - বৌদ্ধ

উৎসব - জলকেলি

রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে জলকেলি উৎসব। এপ্রিল মাসে নববর্ষের প্রাক্কালে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তিন দিন ধরে এ উৎসব উদযাপন করা হয়। তারা বসন্ত উৎসবও পালন করে থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি রাখাইনরা যাদুবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি এবং নানাবিধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিক ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন রাখাইন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

গারো

জনসংখ্যা - ৭৬,৮৪৬ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর।

ধর্ম - খ্রিষ্টান

উৎসব - ওয়ানগালা

গারোদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ওয়ানগালা। 'ওয়ানা' শব্দের অর্থ দেব-দেবীর দানের দ্রব্যসামগ্রী আর 'গালা' শব্দের অর্থ উৎসর্গ করা। এটি গারোদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। সাধারণত বর্ষার শেষে ও শীতের আগে, নতুন ফসল তোলার পর এ-উৎসবের আয়োজন করা হয়। এর আগে গারোদের নতুন খাদ্যশস্য ভোজন নিষেধ থাকে। উৎসর্গ পর্বটি ধর্মীয় দিক আর ভোজ, নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ ও সম্মিলনের দিকটি সামাজিক দিক। তবে গারোদের কাছে ওয়ানগালার মূল বিষয়টি ধর্মীয়। পূজা-অর্চনার মাধ্যমে দেব-দেবীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নানা আবেদন-নিবেদন করা হয় এ-উৎসবে। একারণে অনেকেই এটিকে নবান্ন ও ধন্যবাদের উৎসবও বলে থাকে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতির কেন্দ্র

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা
মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশিরি, নেত্রকোণা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি	১৯৭৮
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	১৯৯৪
ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	রাজশাহী	–
রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	–

- বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হবার স্বরূপ ও সংকট বিশ্লেষণ করুন। উক্ত সংকট মোচনের উপায়সমূহ আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
- 'সুনীল অর্থনীতি' কী? [৪৪তম বিসিএস]
- সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষা করার গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষণপূর্বক আপনার পরামর্শ ব্যক্ত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়? দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- মানবসম্পদ বলতে কি বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস]
- 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক'- আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]

টিকা

- গভীর সমুদ্রবন্দর [৪৪তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy